বেতাল পঞ্চবিংশতি

সলিল লাহিড়ী

মডেল পাবলিশিং হাউস

৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০৭৩

বেতাল পঞ্চবিংশতি

২০৪

সলিল লাহিড়ী

মডেল পাবলিশিং হাউস
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০৭৩

বেতাল পঞ্চবিংশতি

সলিল লাহিড়ী

গল্প শুরুর গল্প

বহু যুগ আগে, উজ্জয়িনী নগরে রাজত্ব করতেন রাজা গন্ধর্বসেন। রাজা গন্ধর্বসেনের ছিল চার সুন্দরী রাণী। ক্রমে রাজার ছয়টি ছেলে জন্মায়। এই ছয় রাজকুমার ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। ক্রমেই তারা যেমন রূপবান হয়ে ওঠে, তেমনি সমস্ত বিষয়ে বীর, বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত বলে খ্যাতি লাভ করতে থাকে। রাজা গন্ধর্বসেন এইভাবেই সুখে রাজত্ব করতে থাকেন। শেষে, বৃদ্ধ বয়সে রাজা গন্ধর্বসেনের মৃত্যু ঘটে। রাজার মৃত্যুর পর সর্বজ্যেষ্ঠ রাজকুমার শংকু সিংহাসনে বসলেন। এদিকে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শাস্ত্রঅধ্যয়নে সুপণ্ডিত মধ্যম রাজকুমার বিক্রমাদিত্য সবার খুব প্রিয় ছিলেন। তাই প্রজারা বারবার অনুরোধ জানাল

মধ্যম রাজকুমারকে সিংহাসনে বসার জন্য। কিন্তু মধ্যম রাজকুমার বিক্রমাদিত্য বললেন— নাঃ, বড়-ভাই থাকতে আমি সিংহাসনে বসতেই পারিনা। বড় ভাইই শুধু উজ্জয়িনীর রাজা হবেন। হলও তাই। শঙ্কু সিংহাসনে বসলেন।

কিন্তু শঙ্কুর রাজ্যশাসনে দেশে অরাজকতা দেখা দিল। প্রজাদের ওপর, অন্যান্য পাঁচ রাজকুমারের ওপর এমনকি চার রাজমাতাদের ওপরও শুরু হল বড়ভাই শঙ্কুর অন্যায় প্রভুত্ব ও অত্যাচার। শেষে, সবার একান্ত অনুরোধে, মধ্যম রাজকুমার বিক্রমাদিত্য শঙ্কুকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে উজ্জয়িনীর নতুন রাজা হয়ে বসলেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এল। বিক্রমাদিত্য অল্পদিনের মধ্যেই যুদ্ধ জয় করে, লক্ষ যোজন বিস্তৃত জম্বুদ্বীপে নিজ রাজ্য বিস্তার করে ফেললেন। বীর বিক্রমাদিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাজা বিক্রমাদিত্য সেই সময় থেকে নতুন বর্ষ গণনা আরম্ভ করলেন। সূত্রপাত হল বিক্রমাব্দের।

প্রজাদের বহু হিতকর কাজ করে, জনসাধারণের নানাবিধ মঙ্গলসাধন করে, ক্রমেই চতুর্দিকে রাজ্যবিস্তার করে, বিক্রমাদিত্য প্রজাগণের প্রিয়রাজা হয়ে উঠলেন। সুখে নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে লাগলেন বিক্রমাদিত্য। এমনি ভাবেই দিন চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন বিক্রমাদিত্যের মনে হল—তাইতো, আমি রাজা হয়ে সুখে সিংহাসনে বসে আছি। মন্ত্রী-সান্ত্রীরা যা বলছে, তাই বিশ্বাস করছি। আমিতো নিজে প্রজারা কেমন আছে, আমার রাজ্যশাসনে তাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে খবর রাখছি না? নাঃ, এতো ঠিক নয়। নিজেরই একবার পরীক্ষা

করা দরকার প্রজাদের অবস্থা। এই ভেবে, বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে গেলেন ছোট ভাই রাজভ্রাতা ভর্তৃহরির ওপর। সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন রাজা বিক্রমাদিত্য।

উজ্জয়িনীতে সেই সময়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করার ফলে সেই ব্রাহ্মণ ইষ্টদেবতার কাছ থেকে আশীর্বাদপূত এক অমর ফল পেলেন। সেই অমর ফল নিয়ে খুশীমনে বাড়ি ফিরে এলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বাড়ি ফিরে ব্রাহ্মণীর হাতে সেই অমরফল দিয়ে বললেন—দেখ ব্রাহ্মণী, দেবতা তুষ্ট হয়ে কি অপূর্ব জিনিস দিয়েছেন। এই আশীর্বাদপূত ফল খেলে মানুষ অমর হয়ে যায়। এই ফল খেয়ে আমরাও তাই অমর হয়ে যাব।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে ব্রাহ্মণী কপাল চাপড়ে বলে উঠল,—হায়, হায়! একি অলুক্ষুণে কথা। আমাদের জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য লেগেই আছে। কোথায় ভাবছি কবে এ যন্ত্রণার শেষ হবে, কবে ওপারে যেতে পারব, তা না অমর হয়ে আজীবন দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগ করব? কি বুদ্ধি তোমার?—ভালমানুষ ব্রাহ্মণকে ধমক-দেয় ব্রাহ্মণী।

—তাইতো! সত্যিইতো এই অমর ফলে আমাদের কি উপকার হবে?—ব্রাহ্মণ বলে ওঠেন। আগে শুনলে দেবতার কাছ থেকে এই ফল নিতামই না। বল ব্রাহ্মণী, এখন এই ফল নিয়ে করি কি?

ব্রাহ্মণী বলল—ভাল রাজা অমর হলে রাজ্যেরই মংগল। তাই

এই অমর ফল আমাদের বর্তমান রাজা ভর্তৃহরিকে দিয়ে এসো। এই ফল দেখে রাজা খুশী হয়ে হয়ত তোমাকে পুরস্কারও দিতে পারেন। সেটাই আমাদের লাভ।

ব্রাহ্মণ অমর ফল এনে দিলেন রাজা ভর্তৃহরিকে। অমর ফলের গুণাগুণ শুনে, ভর্তৃহরি খুশী হয়ে, একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ খুশীমনে বাড়ি ফিরে গেলেন। অমর ফল নিয়ে রাজা ভর্তৃহরি ভাবলেন, এই ফল খেয়ে, আমি অমর হয়ে কি করব? বরং আমার প্রিয় মহিষী এই অমর ফল খেয়ে যদি অমর হয়, তাহলে আমার প্রিয় মহিষী চির-কাল রূপবতীই থাকবেন। সুন্দরী রাণীই তো রাজ্যের শোভা। আর সুন্দরী রাণীকে নিয়ে আমি তখন সুখেই দিন কাটাতে পারব। এইভেবে খুশীমনে অন্তঃপুরে এলেন রাজা ভর্তৃহরি। নিজ মহিষীকে অমর ফল দিয়ে তার গুণাগুণ ব্যাখা করে, অমর ফল খাবার অনুরোধ জানিয়ে আবার রাজসভায় ফিরে গেলেন। রাজসভায় ভর্তৃহরি ফিরে যেতেই রাজমহিষী অমর ফল হাতে নিয়ে চিন্তা করতে বসলেন। রাজমহিষীর প্রিয়পাত্র ছিল উজ্জয়িনীর সুদর্শন নগরপাল। রাজমহিষীর সংগে এই নগর-পালের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। রাজমহিষী ভাবলেন, এই ফল খেয়ে আমার অমর হওয়ার চেয়ে নগরপালকে অমর করাই শ্রেয়। তাতে রাজ্যের মংগল। আর নগরপাল আজীবন রূপ-বান হয়ে আমার বন্ধু হয়ে থাকলে, তাতে আমারও আনন্দ হবে। এই সব চিন্তা করে, গোপনে নগরপালকে রাজ-অন্তঃপুরে এনে অমর ফলের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে ফলটি খাবার অনুরোধ করলেন। নগরপাল অমরফলটি বাড়িতে গিয়ে খাবেন, এই

আশ্বাস দিয়ে অমরফলটি নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরলেন।

এদিকে নগরপাল বাড়ি ফিরে ভাবলেন এই অমর ফল আমি খাব কেন? বরং রাজ্যের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী রাজনর্তকীকে ফলটি দিলে সে চিরকাল রূপবতী হয়ে নৃত্যকলা দেখাতে পারবে। এই নর্তকীর সংগে আবার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল নগরপালের। এই চিন্তা করে নগরপাল অমরফলটি রাজ-নর্তকীর হাতে দিল।

অমর ফলটি পেয়ে রাজনর্তকী চিন্তা করল, আমি অমর হয়ে কি করব? বরং রাজা যদি অমর হন, তবে এই রাজ্যে আমার সমাদর চিরকালের জন্য থাকবে। যেমনটি ভাবা, ঠিক তেমনটিই করল রাজনর্তকী।

উজ্জয়িনীর রাজা ভর্তৃহরি তখন রাজসিংহাসনে বসে রাজ-কার্য পরিচালনা করছেন। এমনি সময়ে অমর ফল হাতে রাজ-নর্তকী রাজসভায় এসে, রাজাকে প্রণাম করে, তাঁর হাতে অমর ফলটি দিল। অমর ফল হাতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন ভর্তৃহরি। শুনলেন রাজ-নর্তকী নগরপালের কাছ থেকে এই অমূল্য অমর ফল পেয়েছেন। নর্তকীকে পুরস্কার দিয়ে অমর ফলটি হাতে নিয়ে ভর্তৃহরি রাজ-অন্তঃপুরে গেলেন। রাজ-মহিষীকে জিজ্ঞেস করলেন—অমরফলটি কি খেয়েছ?—রাজ-মহিষী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে উত্তর দিলেন—বাঃ খাব না? মহারাজ নিজ হাতে যে অমূল্য ফল দিয়েছেন, সে কি না খেয়ে থাকতে পারি?

রাজমহিষীর কথা শুনে ভর্তৃহরি বুঝলেন তাঁর রাণী শুধু মিথ্যা কথাই বলছে না, তিনি দুষ্টা রাণী। তিনি মনে মনে ভাবলেন, ছিঃ, এতদিন আমি এই মিথ্যাবাদী দুষ্টা রাণীকে বিশ্বাস

করেছি ? এই লোভী নগরপালের ওপর রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছি ? নাঃ, এই পৃথিবীতে দেখছি কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। তাই এই রাজ্যে থেকে লাভও নেই, রাজ্য পরিচালনার ইচ্ছেও নেই। এসব চিন্তা করে, ভর্তৃহরি রাজ-অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে হাত-পা ধুয়ে, অমর ফলটি নিজেই খেয়ে ফেললেন। তারপর রাজ্য ছেড়ে গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই অরণ্যেই ভর্তৃহরি যোগ-সাধনায় আত্মনিবেদন করলেন।

ভর্তৃহরি চলে যাওয়ায় রাজার অভাবে বিক্রমাদিত্যের রাজসিংহাসন শূন্য রইল। উজ্জয়িনীতে অরাজকতা দেখা দিল। উজ্জয়িনীর অরাজকতার খবর পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র এক যক্ষকে পাঠালেন উজ্জয়িনীতে রাজ্যরক্ষা করার জন্য। যক্ষ অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে রাজ্য পাহারা দিতে লাগল। রাজ্যের অরাজকতা ধীরে ধীরে কমে এল। যক্ষ দেশ-বিদেশে প্রচার করে দিল, ভর্তৃহরির রাজ্যত্যাগের কথা।

ক্রমে এই খবর ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্যের কানে পেঁছাল। রাজার অভাবে, প্রজাদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে—বিক্রমা-দিত্য দ্রুত ফিরে এলেন উজ্জয়িনীতে। বিক্রমাদিত্য যখন উজ্জয়িনীর তোরণদ্বারে এসে পেঁছালেন তখন মধ্যরাত। বিক্রমাদিত্য যেই তোরণদ্বার দিয়ে নিজ রাজ্যে প্রবেশ করতে যাবেন, ইন্দ্রপ্রেরিত নগর রক্ষক সেই যক্ষ পথরোধ করে দাঁড়াল।

যক্ষ হুংকার দিয়ে উঠল—কে রে তুই, মাঝরাতে চোরের মত রাজ্যের মধ্যে ঢুকছিস ?

বিক্রমাদিত্য থমকে দাঁড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন,—তুই কে ?

আমি বিক্রমাদিত্য, নিজ রাজ্যে ঢুকছি, তুই বাধা দেবার কে ?—ধমকে ওঠেন রাজা বিক্রমাদিত ।

—আমি ,যক্ষ। আমাকে দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া আর কাউকে আমি এই রাজ্যে ঢুকতে দিতে পারি না। তবে, তুমি যদি সত্যিই রাজা বিক্রমাদিত্য হও, তবে এসো, যুদ্ধ কর আমার সংগে। একমাত্র বীর বিক্রমাদিত্যই আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারে। এই বলে যক্ষ তরবারী নিয়ে বিক্রমাদিত্যের সামনে এসে দাঁড়াল।

শুরু হল প্রচণ্ড যুদ্ধ বিক্রমাদিত্য আর যক্ষের মধ্যে। ভীষণ লড়াই চলল, বহুক্ষণ ধরে। শেষে রাজা বিক্রমাদিত্য যক্ষকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপর চেপে বসে, বুকে তলোয়ার ঠেকিয়ে বললেন—কিহে, এখন বিশ্বাস হচ্ছে, আমি রাজা বিক্রমাদিত্য ?

যক্ষ হেসে বলল—হ্যাঁ। এই তেজ, এই শক্তি দেখে মনে হচ্ছে সত্যিই রাজা বিক্রমাদিত্য। এখন ছাড়ো, উঠে বসি, আর তোমাকে জীবনদান করি।

এবার বিক্রমাদিত্যও হেসে উঠলেন। বললেন - নাঃ নেহাতই পাগল তুই। তা না হলে এরকম অদ্ভুত কথা বলিস ? আমি চাইলে এক্ষুনি তোকে মেরে ফেলেতে পারি। আমার দয়ায় তোর জীবন নির্ভর করছে। তুই আবার আমাকে প্রাণদান করবি কি ?

যক্ষ এবার মুচিক হাসে। বলে—মহারাজ, তুমি রাজা বিক্রমাদিত্য বলেই বলছি, আমি যা বলব মন দিয়ে শোন, সেই মত কাজ কর। তাহলে দীর্ঘায়ু হয়ে সুখে রাজত্ব চালাতে পারবে। আর কথা না শুনলে অচিরাৎ তোমার জীবন বিপন্ন হবে। রাজা, আমি তোমার শুভাকাঙ্খী।

যক্ষের কথায় বিক্রমাদিত্য অবাক হলেন। রাজা ভাবলেন, যক্ষ যখন ইন্দ্ররাজের প্রেরিত দূত, তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, শোনাই যাক না তার কথা। বিক্রমাদিত্য যক্ষকে ছেড়ে দিলেন। যক্ষ মাটি ছেড়ে উঠে বসল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, দম নিয়ে যক্ষ তার কাহিনী বলতে শুরু করল—

মহারাজ, কাহিনীটা মন দিয়ে শোন—
প্রাচীনকালে ভোগবতী নগরে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তার নাম ছিল চন্দ্রভানু। একদিন মৃগয়ার জন্য বনের মধ্যে প্রবেশ করে রাজা চন্দ্রভানু দেখতে পেলেন, একজন তপস্বী গাছের ডালে পা রেখে, নিচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ধূমপান করছেন। ঘটনাটি দেখে বিস্মিত হলেন রাজা। লোকজনের কাছে অনুসন্ধান করে চন্দ্রভানু জানতে পারলেন, তপস্বী এই নির্জন বনে, এইভাবে থেকে, কঠোর তপস্যা করেন। তপস্বী কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। দীর্ঘকাল এইভাবেই আছেন তপস্বী। বিস্মিত রাজা রাজধানীতে ফিরে, রাজসভায় এই কাহিনী বিবৃত করলেন। রাজা চন্দ্রভানু বললেন, এই অদ্ভুত তপস্বীকে যিনি তাঁর রাজসভায় আনতে পারবেন, তাঁকে একলাখ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন।
রাজার এই ঘোষণা রাজ্যমধ্যে দ্রুত রাষ্ট্র হয়ে গেল। ক্রমে এই ঘোষণা কানে এল এক পরমাসুন্দরী রমণীর। সুন্দরী রমণী রাজসভায় এসে, রাজা চন্দ্রভানুকে প্রণাম করে বলল, মহারাজ, কঠোর তপস্যায় রত ঐ তপস্বীকে আমিই এই রাজসভায় নিয়ে

আসতে পারি। আপনি আদেশ করুন, আমি এই অসাধ্য কাজে অগ্রসর হই।

রাজা অবাক্ হলেন রমনীর কথা শুনে। তবুও আদেশ দিলেন। সুন্দরী কন্যা বনের মধ্যে এসে খুঁজতে খুঁজতে ঠিক বার করে ফেলল ঝুলন্ত তপস্বীকে। তপস্বী তখন গাছের ডালে পা লাগিয়ে, মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে প্রলম্বিত হয়ে ধূমপান করছেন। শীর্ণকায় দেহ, নিশ্চুপ। তপস্বী কারুর দিকে দৃষ্টি-পাত না করে, কারুর সংগে কথা না বলে ঝুলন্ত অবস্থাতেই থাকলেন। সবকিছু দেখে, সুন্দরী রমণী বুঝতে পারল, কঠোর সাধনায় ব্রত এই তপস্বীকে সহজে সাধনচ্যুত করা যাবে না।

চিন্তা করতে করতে রমনী এক উপায় বার করে ফেলল। সে ঐ বনেই, তপস্বীর সাধনবৃক্ষ থেকে কিছুটা দূরে, একটা সুন্দর কুটির বানিয়ে, চারদিকে মনোরম বাগান তৈরি করে বসবাস শুরু করল।

এরপর প্রতিদিন সুস্বাদু মোহনভোগ তৈরি করে, গাছে ঝুলন্ত তপস্বীর কাছে গিয়ে তাকে একটু মোহনভোগ খাইয়ে আসতে লাগল। তপস্বী তো কারুর সংগে কথা বলেন না। তাই সুন্দরী রমণীর কাজে বাধাও দিতে পারেন না। বরং অনাহারী তপস্বী সুস্বাদু মোহনভোগ মুখে পেয়ে খেয়েই ফেললেন। এইভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে সুস্বাদু মোহনভোগ খেয়ে, তপস্বীর অস্থিচর্মসার চেহারা ফিরতে লাগল। গায়ে মাংস লেগে চুকচুকে মোটাসোটা চেহারা হল, গায়ে শক্তি ফিরল। এতদিনে তপস্বী চোখ খুলে তাকালেন। সামনে সুন্দরী রমণীকে দেখে অবাক হলেন। গাছ থেকে নেমে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—কে

তুমি ? কিজন্য নির্জন এই বনে একাকী এসেছ ? কি চাই তোমার?
সুন্দরী ঐ রমণী দ্রুত চিন্তা করে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বলল—
আমি দেবকন্যা। আমি দেবলোকেই সাধনা করি। তবে, তীর্থ
পর্যটন করব বলে বেরিয়ে, নানান দেশ ঘুরে, শেষে ভারতবর্ষে
এসে যোগাভ্যাস করব বলে এই বনে আশ্রম বানিয়ে আছি।
আশ্রমের কাছেই আপনাকে দেখতে পেয়ে আপনার দর্শনলাভের
আশায় এখানে এসেছি। আপনাকে দেখতে পেয়ে আমি ধন্য।
তপস্বীও সব শুনে বললেন—তোমাকে দেখে, তোমার নম্রতায়,
তোমার সেবায় আমি বড় খুশী হয়েছি। জানই তো পুণ্যসঞ্চয়ীরাই
সাধুসঙ্গ লাভ করে। তাই আমার সঙ্গ যখন পেলে তখন বুঝতেই
হবে তুমিও পুণ্যবতী নারী। তোমার আশ্রমও তাই পুণ্যধাম।
চল, তোমার আশ্রম দেখে আসি।
সুচতুরা সুন্দরী কন্যা এই সুযোগে তপস্বীকে তাড়াতাড়ি
নিজের কুটিরে নিয়ে এল। সুস্বাদু খাদ্য, সুমিষ্ট পানীয় খেতে
দিল। নানানভাবে তপস্বীকে তুষ্ট করতে লাগল। তপস্বী
আদর-যত্নে তৃপ্ত হলেন।
সুচতুরা কন্যার আতিথেয়তায়, আদর-যত্নে, তপস্বী নিজের
যোগাভ্যাস, যোগীবেশ, সবকিছুই ত্যাগ করে সুন্দরী সুচতুরার
কুটিরে সেদিন থেকেই গেলেন। কন্যার ওপর ক্রমে তপস্বীর এমন
মোহ জন্মাল যে অচিরেই সেই সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করে
কন্যাটির কুটিরেই সুখে দিনযাপন করতে লাগলেন। ক্রমে এই-
ভাবে দিন পার হল, মাস পার হল, বছর শেষ হল। সুন্দরী
রমনীর এক পুত্রসন্তান জন্মাল। পুত্রকে দেখে সংসারী তপস্বী
ভারী খুশী হলেন!

এই সময়, সেই সুচতুরা সুন্দরী নারী তার স্বামী সংসারী তপস্বীকে বলল—আমরা সংসারে আবদ্ধ হয়ে আছি বহুদিন। তাই দীর্ঘদিন তীর্থযাত্রায় আর যাওয়া হয়নি। চল, এইবার কিছুদিন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই।

তপস্বী স্ত্রীর কথায় রাজী হয়ে তীর্থভ্রমণের জন্য রওনা হল। সুন্দরী রমণী তার শিশুপুত্রকে তপস্বীর কোলে দিয়ে বলল—এই ছেলেকে কোলে নিয়ে দীর্ঘপথ পরিভ্রমণে যাওয়া কি সম্ভব? নাও ছেলেকে কোলে নাও।—এই বলে, তপস্বীর কোলে ছেলেকে দিয়ে, তীর্থভ্রমণের ছলে রাজা চন্দ্রভানুর রাজসভায় এসে উপস্থিত হোল।

সুন্দরী রমনীর পিছনে, শিশু-পুত্রকে কোলে নিয়ে তপস্বীকে আসতে দেখে সভাসদগণ বিস্ময়ে বলে উঠলেন—আরে! কি আশ্চর্য! সুচতুরা রমণী সত্যিই চাতুর্যে তপস্বীকে তপস্যাভঙ্গ করিয়ে সংসারী বানিয়েছে! শিশুপুত্রসহ সংসারীর এই অবস্থা দেখে রাজা চন্দ্রভানু ও তাঁর সভাসদগণ হেসে উঠলেন।

সভাসদগণ বলে উঠলেন—মহারাজা সুচতুরা এই রমনী সতিাই এক লাখ স্বর্ণমুদ্রা পাবার যোগ্য। তপস্বীর তপস্যা ভংগ করিয়ে সত্যিই অসাধ্য সাধন করেছে।

সভাসদদের কথায় তপস্বীর মোহাচ্ছন্নতা দূর হল। বুঝতে পারল, রাজা চন্দ্রভানু ও এই নারী ছলে তার তপস্যাভঙ্গ করিয়েছে—ছিঃ ছিঃ, আমি কি বোকা? নারীর রূপ ও চাতুরীতে ভুলে আমি একি করেছি? রাগে, নিজেকে ধিক্কার দেয় তপস্বী। রাগে কাঁপতে কাঁপতে কোলের ছেলেকে মাটিতে ফেলে রাজসভা ছেড়ে বনে চলে যায় তপস্বী। সেখানে দীর্ঘকাল

কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে সেই তপস্বী অনন্ত শক্তির অধিকারী হয়। এরপর সেই শক্তিধর সিদ্ধ তপস্বী রাজা চন্দ্রভানুকে সিদ্ধশক্তির বলে হত্যা করে অপমানের প্রতিশোধ নেয়।

এই গল্পকাহিনীর শেষে যক্ষ বলে—মহারাজ, তুমি, ভোগবতীর রাজা চন্দ্রভানু আর ঐ তন্ত্রসিদ্ধ তপস্বী একই নগরে, একই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করে তুমি রাজ্য চালাচ্ছ, চন্দ্রভানু তেলীর ঘরে জন্মালেও ভাগ্যের বলে ভোগবতী নগরের রাজা হয়েছে। কিন্তু ঐ তপস্বী কুমোরের ঘরে জন্মে, মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে, রাজা চন্দ্রভানুকে বধ করে শ্মশানের শিরীষ গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছে। এখন মন্ত্রসিদ্ধ ঐ তপস্বী, তোমাকেও হত্যা করে যদি ঐ শিরীষ গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখতে পারে, তাহলে তপস্বীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। মহারাজ, তুমি যদি ঐ ভয়ংকর তপস্বীর প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা পাও তবে দীর্ঘকাল সুখে রাজত্ব ভোগ করতে পারবে। শোন রাজা, এইসব গোপন কথা জানিয়ে তোমায় সতর্ক করে দিলাম। আশা করি, এই তথ্য জানার জন্যই তুমি সতর্ক হবে আর তারই ফলে তোমার জীবন রক্ষা পাবে।—এই কথা শেষ করেই যক্ষ নিজের জায়গায় ফিরে চলে গেল। বিস্মিত রাজা যক্ষের কথাগুলোই চিন্তা করতে লাগলেন।

ঠিক এই ঘটনার পরের দিনই বিক্রমাদিত্য রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলেন। দীর্ঘকাল পরে রাজা বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসনে দেখে প্রজারা খুশীতে ঝলমল করে উঠল। আনন্দ

উৎসব শুরু হোল। প্রজারা রাজা বিক্রমাদিত্যের জয়ধ্বনি করে উঠল। রাজা বিক্রমাদিত্য মহাসুখে শান্তিতে রাজ্যপরিচালনা করতে লাগলেন। এইভাবেই দিন পার হয়ে যেতে লাগল। এমনি সময়ে, একদিন সকালে রাজা বিক্রমাদিত্য যখন রাজসভায় বসে আছেন তখন রাজসভায় উপস্থিত হলেন শান্তশীল বলে এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী রাজা বিক্রমাদিত্যকে একটি বেল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বিক্রমাদিত্য বেলটি হাতে নিয়ে সন্ন্যাসীকে নমস্কার করে সন্ন্যাসীর কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করলেন, নানাবিধ ধর্মালোচনা করলেন। শেষে সন্ন্যাসী রাজাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেলেন। সন্ন্যাসী রাজসভা ছেড়ে যেতেই রাজা বিক্রমাদিত্য ভাবতে শুরু করলেন, যক্ষ বর্ণিত মন্ত্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী কি তবে ইনিই? ইনি কি প্রতিহিংসার জন্য এসেছেন? অনেক ভাবনা-চিন্তা করে রাজা বিক্রমাদিত্য সন্ন্যাসীপ্রদত্ত বেলটিকে না ভেঙ্গে রাজভাণ্ডারীর হাতে দিয়ে সেটাকে রাজভাণ্ডারে রেখে দিতে বললেন।

পরের দিনই সন্ন্যাসী শান্তশীল আবার বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উপস্থিত হলেন। ঠিক আগের দিনের মতই বিক্রমাদিত্যকে একটি বেল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। রাজসভায় কিছুক্ষণ থেকে চলে গেলেন সন্ন্যাসী শান্তশীল। রাজা বিক্রমাদিত্যও ঠিক আগের দিনের মতই বেলটিকে না ভেঙ্গে, ভাণ্ডারীকে বেলটিকে ভাণ্ডারে রাখতে দিলেন।

এমনি করেই অনেকদিন পার হয়ে গেল। একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য রাজসহচরদের নিয়ে অশ্বশালা দেখতে গেছেন। সন্ন্যাসী শান্তশীল সেখানেও উপস্থিত হয়ে রাজাকে অন্যদিনের মতই একটি বেল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

সন্ন্যাসীকে অশ্বশালায় উপস্থিত দেখেতো রাজা বিক্রমাদিত্য অবাক। আর এইজন্যই বিস্মিত রাজার হাত থেকে সন্ন্যাসীপ্রদত্ত বেলফল হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেল। বেলটি মাটিতে পড়েই দু-টুকরো হয়ে গেল। আর তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল উজ্জ্বল ঝক্‌মকে একটি মহামূল্য রত্ন।

ঘটনাটি দেখে রাজা, তাঁর পাত্রমিত্র, সব্বাইতো অবাক। একি! বেলের মধ্যে এমন মহামূল্য মণি-রত্ন! বিস্মিত রাজা বিক্রমাদিত্য শান্তশীলকে জিজ্ঞেস করলেন—সন্ন্যাসী, এই দামী রত্নময় বেল আমায় কেন দিলেন?

সন্ন্যাসী শান্তশীল বললেন মহারাজ, শাস্ত্রেই আছে রাজা, গুরু, জ্যোতিষী আর চিকিৎসকের কাছে খালি হাতে যাওয়া উচিত নয়। সেজন্যই আমি রত্নময় বেলফল আপনাকে উপহার দিয়েছি। মহারাজ, শুধু আজকের এই বেলফলেই রত্ন আছে তা নয়, এর আগেও যতগুলি বেল আপনাকে আশীর্বাদী উপহার দিয়েছি, সবগুলিতেই একটি করে এমনই রত্ন আছে।

সন্ন্যাসী শান্তশীলের কথায় রাজা বিক্রমাদিত্য সেই মুহূর্তেই ভাণ্ডারীকে বেলফলগুলোকে রাজভাণ্ডার থেকে নিয়ে আসতে বললেন। বেলফলগুলো এক এক করে ভেঙ্গে ফেলতেই প্রতিটি বেলের মধ্য থেকে একটি করে উজ্জ্বল রত্ন ঝক্‌মক করে উঠল। রত্নগুলির দাম যাচাই করার জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য রাজসভায় ফিরে গিয়ে রাজজহুরীকে ডেকে পাঠালেন। জহুরী ধীরে ধীরে প্রতিটি রত্ন পরীক্ষা করে বলল, প্রতিটি রত্নই সর্বাঙ্গসুন্দর, অমূল্য। প্রতিটি রত্নের মূল্য কোটি স্বর্ণমুদ্রার কম তো নয়ই।

রাজা বিক্রমাদিত্য রত্নগুলির মূল্য শুনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে

গেলেন। সমাদরে সন্ন্যাসী শান্তশীলকে সিংহাসনের ঠিক পাশেই বসালেন। বললেন—সন্ন্যাসী এই অমূল্য রত্ন কোথায় পেলেন আপনি? আর পেয়েছেনই যখন, এগুলো আমায় দিয়ে দিলেন কেন? বলুন, আপনার এই উপহারের বিনিময়ে আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

সন্ন্যাসী শান্তশীল বললেন—মহারাজ, সত্যিই যদি আমার জন্য কিছু করার ইচ্ছে থাকে, তবে আমার কথা গোপনেই বলতে চাই। সবকথা সবসময়ে সবার সামনে বলা উচিত নয়।

রাজা বিক্রমাদিত্য সন্ন্যাসী শান্তশীলকে নিয়ে নিভৃতে গেলেন। শান্তশীল বললেন—মহারাজ, গোদাবরী নদীরধারে শ্মশানেআমি মন্ত্রসাধনা করে অষ্টসিদ্ধিলাভ করব ইচ্ছা করেছি। আমার সিদ্ধিলাভের জন্য আগামী ভাদ্রের কৃষ্ণা-চতুর্দশী তিথিতে, যখন আমি ঐ সাধনায় বসব, তখন সেদিন সন্ধ্যা থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত একাকী আপনি উপস্থিত থাকলে আমার সাধনা সিদ্ধিলাভ করবে। মনে রাখবেন, এই কথা গোপনে রাখবেন।

বিক্রমাদিত্য এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মত হলেন। বললেন - সন্ন্যাসী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নির্দিষ্ট দিনে, সন্ধ্যায়, গোদাবরী তীরের শ্মশানে, আপনার সাধনস্থলে উপস্থিত হব। আমার উপস্থিতিতে যদি আপনার সিদ্ধিলাভ হয় তবে আমি নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকব।

রাজা বিক্রমাদিত্যকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে সন্ন্যাসী শান্তশীল রাজভবন ছেড়ে চলে গেলেন।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন এল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা

বিক্রমাদিত্য সন্ধ্যাবেলায় একটি তলোয়ার নিয়ে, একাকী গোদাবরী তীরের শ্মশানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শ্মশানে পোঁছিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্য দেখেন সন্ন্যাসী শান্তশীল এক মৃতদেহের ওপর বসে যোগাসনে আছেন। তাঁকে ঘিরে বিকটাকার অসংখ্য ভূত, প্রেত, শঙ্খিনী, ডাকিনী নেচে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীও দুটো মড়ার খুলি বাজিয়ে বিকট শব্দ করে তন্ত্রসাধনা করে চলেছেন। ভয়ংকর এইসব ব্যাপার দেখেও কিন্তু ভয় পেলেন না রাজা।

বিক্রমাদিত্য সন্ন্যাসীকে দুহাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন—সন্ন্যাসী, আমি এসেছি। বলুন, এখন আমার কাজ কি?

সন্ন্যাসী শান্তশীল বললেন,—মহারাজ, আপনার মত যাঁরা সৎ তারাই প্রতিজ্ঞা পালন করার জন্য জীবনপাত করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। আপনি প্রতিজ্ঞা রেখেছেন দেখে আমি খুশী। শুনুন আমার সাধনার সিদ্ধিলাভের পথে কি ভাবে আপনি সাহায্য করতে পারেন।

বিক্রমাদিত্য বললেন—সন্ন্যাসী আমি সর্বভাবেই আপনাকে সাহায্য করতে চাই। বলুন, আমায় কি ভাবে কাজ করতে হবে?

শান্তশীল বল্লেন—এই শ্মশান থেকে আরও দক্ষিণে, দুই ক্রোশ দূরে, এক শ্মশান আছে। সেই শ্মশানে এক দীর্ঘকায় শিরীষ গাছ আছে। সেই গাছে ঝুলানো আছে একটি শব। মহারাজ আপনার কাজ হবে ঐ শিরীষ গাছ থেকে শবকে নামিয়ে এইখানে নিয়ে আসা। কাজটি এমন কিছু কঠিনসাধ্য নয়।

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন,—নিশ্চিন্ত থাকুন সন্ন্যাসী, শবকে অচিরেই আপনার কাছে নিয়ে আসছি।

কৃষ্ণ-চতুর্দশীর কালো আঠার রাতে রাজা বিক্রমাদিত্য চলেছেন দুই ক্রোশ দূরের শ্মশানে। আধার রাতে সামান্য দূরেরও কোন কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার ওপরে শুরু হোল ঝরঝর করে বৃষ্টি। নির্জন রাস্তায় যেতে যেতে শুনতে পেলেন রাজা, চারপাশে ভূত-প্রেতের চিৎকার-উল্লাস, কিউ-মিউ, কিউ-মিউ শব্দ। সাহসী রাজা বিক্রমাদিত্য এতেও কিন্তু ভয় পেলেন না। চলতে চলতে রাজা শেষে এসে পেঁছালেন দু-ক্রোশ দূরের শ্মশানে। শ্মশানে পেঁছাতেই চোখে পড়ল ভয়ংকর দৃশ্য রাজার, ভূত-প্রেত শ্মশান ঘিরে নৃত্য করছে, আর জীবন্ত মানুষ ধরে খাচ্ছে। ডাকিনীরা ছেলে-মেয়ে ধরে চিবাচ্ছে আর খেয়ে ফেলছে।

রাজা কিন্তু এতেও ভয় পেলেন না। তিনি খুঁজতে শুরু করলেন কোথায় আছে সেই বিরাট শিরীষ গাছ। খুঁজতে-খুঁজতে রাজা পেঁছালেন শিরীষ গাছের কাছে। গাছের সামনে এসে দেখেন, গাছের মূল থেকে আগা পর্যন্ত ঝিক-ঝিক করে, আগুন জ্বলছে আর চার পাশের বাতাস থেকে মার-মার, কাট-কাট শব্দ হচ্ছে। আর গাছের মাথায় ডাল থেকে ঝুলছে একটি শব। শবটি দড়ি দিয়ে বাঁধা। শবের মাথা নিচের দিকে, পা ওপর দিকে, ডালের সংগে বাঁধা।

সবকিছু দেখে বিচক্ষণ রাজা বিক্রমাদিত্য চিন্তা করে ঠিক করলেন, যক্ষ যে সন্ন্যাসী থেকে সাবধান হতে বলেছিল, শান্ত-শীলই সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ সন্ন্যাসী। রাজা সবকিছু ভেবে-চিন্তে, শিরীষ গাছে উঠে ঝুলন্ত-শবের দড়িটা কেটে দিলেন। শবটি সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল। আর তারপরই চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

রাজা বিক্রমাদিত্য দ্রুত গাছ থেকে মাটিতে নেমে এলেন। শবকে মানুষের মত করে কাঁদতে দেখে অবাক হলেন। শবকে জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কার শব? কে তোমায় এমনি করে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে? কেন রেখেছে?
রাজার কথাশুনে ভূতলশায়ী শব এবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।
শবের এমন বিচিত্র ব্যবহার দেখেতো রাজা অবাক। বিক্রমাদিত্য চিন্তা করতে লাগলেন, শব আবার হাঁসে-কাঁদে নাকি? এরই ফাঁকে শব মড়াৎ করে গাছে উঠে, ঠিক আগের মতই মাথা নিচু করে ঝুলতে লাগল। রাজা তা দেখে, আবার গাছে উঠে, দড়ি কেটে দিলেন। শব যাতে মাটিতে না পড়ে যায়। সেজন্য হাত ধরে শবকে গাছ থেকে নামালেন।
মাটিতে শবকে নামিয়ে, রাজা বিক্রমাদিত্য শবকে তার সংগে যাবার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। সন্ন্যাসী শান্তশীলের কাছে তার প্রতিজ্ঞার কথাও বললেন। শব সবকিছু শুনেও নিশ্চুপ থাকল।
বিজ্ঞ রাজা বিক্রমাদিত্য চিন্তা করে বুঝতে পারলেন, এই শব সেই তেলী ভোগবতী-রাজ চন্দ্রভানুর। আর ঐ তপস্বী কুমোরের ঘরে জন্মে, মাত্র মন্ত্র-হয়ে, চন্দ্রভানুকে মেরে তার এই শব শিরীষ গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল। বিক্রমাদিত্য শবের সংগে আর কোনও কথা না বলে, চাদর দিয়ে শবকে ভাল করে বেঁধে, কাঁধে ফেলে তপস্বী শান্তশীলের কাছে শ্মশানে নিয়ে চললেন।
অর্দ্ধেক পথ আসবার পর শব রাজা বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস

করল—এই যে বীরপুরুষ, কে তুমি ? কোথায়, কিসের জন্য আমায় নিয়ে যাচ্ছ ?

রাজা উত্তর দিলেন,—আমি রাজা বিক্রমাদিত্য। শান্তশীল সন্ন্যাসীর অনুরোধে, তোমায় নিয়ে চলেছি, গোদাবরী তীরের শ্মশানে। কিন্তু তুমি কে ?

শব উত্তর দিল—আমি হচ্ছি বেতাল। মহারাজ! তোমার সাহস ও সততা প্রশংসনীয়। শোন রাজা, পণ্ডিত আর বুদ্ধিমান লোকেরা অযথা চুপ করে থেকে সময় নষ্ট না করে সৎকাজ ও শাস্ত্রচিন্তায় সময় অতিবাহিত করেন। তাই আমরাও অযথা চুপ করে না থেকে, এস, গল্প করে দীর্ঘপথ অতিক্রম করি।

রাজা বিক্রমাদিত্য সবশুনে বললেন—বেতাল, তোমার প্রস্তাব খুবই ভাল।

বেতাল বলল মহারাজ, আমি একটি করে গল্প তোমায় শোনার আর প্রত্যেকটি গল্পের শেষে একটি করে প্রশ্ন করব। প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে আমি আবার শিরীষ গাছে ফিরে গিয়ে ঝুলতে থাকব। আর যদি জেনে শুনেও সঠিক উত্তর না দাও, তবে, বুক ফেটে তুমি মরে যাবে।

উপায়ান্তর না দেখে, রাজা বিক্রমাদিত্য প্রস্তাবে সম্মত হলেন। বেতালও শুরু করল তার প্রথম গল্প———

বেতালের প্রথম গল্প

বেতাল বলল—শোন মহারাজ—

বারাণসীতে প্রতাপমুকুট নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। রাজা প্রতাপ মুকুটের রাণীর নাম ছিল মহাদেবী। আর এই বারাণসী রাজ্যের একটিই মাত্র পুত্র সন্তান ছিল। নাম বজ্রমুকুট।

রাজা-রাণীর অত্যন্ত আদরের সন্তান ছিল বজ্রমুকুট। রাজকুমার একদিন মৃগয়ায় রওনা হলেন, সংগে মন্ত্রীপুত্র। ঘোড়ায় চড়ে শিকারের পিছনে এই বন, ও বন, ঘুরতে ঘুরতে, ক্রমেই তারা গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করল। গভীর বনের মধ্যে সামনেই দেখতে পেল টলমল করছে পুষ্করিনী। রাজকুমার আর মন্ত্রীপুত্র দুজনেই পরিশ্রমে ক্লান্ত। তাই দুজনেই পুষ্করিণীর ধারে, বকুল গাছের তলায় নিজেদের ঘোড়া দুটোকে

বেঁধে, পুষ্করিণীতে স্নান করতে লাগল মনের সুখে। ঠান্ডা দীঘির জলে স্নান করে দুজনের ক্লান্তি দূর হোল। স্নানের পর খেয়াল হোল দুজনের, একটু দূরেই শিবমন্দির। রাজকুমার বজ্রমুকুট আর মন্ত্রীপুত্র শিবমন্দিরে পুজো দিতে গেল।

রাজপুত্র বজ্রমুকুট আগে পুজো করে মন্দিরের বাইরে এলো। মন্ত্রীপুত্র কিন্তু তখনও মন্দিরের ভিতরে পুজোয় মগ্ন। এদিকে বাইরে এসে বজ্রমুকুট বনের মধ্যে সামান্য এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করছে।

ঠিক সেই সময়, অপরূপ—অসামান্য সুন্দরী এক রাজকন্যাও এসেছিলো মন্দিরে পুজো দিতে। পুজো শেষে, সখীদের নিয়ে, রাজকন্যা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গভীর বনে কে আর আসবে, তাই খুব নিশ্চিন্তে রাজকন্যা সখীদের নিয়ে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদিকে, রাজপুত্র বজ্রমুকুটও একলা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেই রাজকন্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজপুত্র আর রাজকন্যা দুজনেই দুজনকে দেখে তো মুগ্ধ। কারুর মুখে কথা সরে না। রাজকন্যা তখন কোনও কথা না বলে, মাথায় গোজা যে পদ্মফুল ছিল সেটা হাতে নিয়ে কানে ছোঁয়াল, তারপর দাঁত দিয়ে ফুলকে কেটে পায়ের নিচে ফেলল। শেষে রাজপুত্রের দিকে বারবার তাকিয়ে সখীদের নিয়ে চলে গেম। কোনও কথা না বলে এভাবে রাজকন্যা চলে যাওয়াতে রাজপুত্র বজ্রমুকুটের বনটা খারাপ হয়ে গেল। শেষে মন্ত্রী-পুত্রের কাছে গিয়ে বলল—বন্ধু, কিছুক্ষণ আগে আমি এক পরমা সুন্দরী মেয়েকে দেখলাম। মেয়েটি কে, কোথা থেকে এসেছে,

কার মেয়ে কিছুই জানি না। কিন্তু বন্ধু, ঐ সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে না পারলে আমি জীবনই বিসর্জন দেব।

মন্ত্রীপুত্র রাজকুমারের এই অবস্থা দেখে তখনই তাকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

কিন্তু বজ্রমুকুটকে ফিরিয়ে আনলে কি হবে? রাজকুমার তো আহার-নিদ্রা, কাজকর্ম সবই ত্যাগ করেছে। শুধু একলা নির্জনে বসে থাকে, কারুর সংগে কথাও বলে না, মেলামেশাও করে না। প্রায় পাগলের মত অবস্থা হোল রাজপুত্র বজ্রমুকুটের। শেষকালে সেই রাজকন্যার একটা ছবি এঁকে দিন-রাত বুকে নিয়ে, বসে বসে দিন কাটাতে লাগল বজ্রমুকুট।

বন্ধুর এই অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হল মন্ত্রীপুত্রের। রাজপুত্রকে কত বোঝাল, কতভাবে ভোলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনও ফল হোল না। রাজপুত্র সেই শুকনো মুখে, রাজকন্যার ছবি বুকে নিয়ে, চুপ করে বসেই থাকে।

মন্ত্রীপুত্র বুঝল রাজপুত্রর জন্য কিছু না করলে চলবেই না। নানান্ কিছু ভেবে চিন্তে মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করল—বন্ধু, সেই কন্যা তোমার সংগে কোনও কথা বলেছিল? তুমি কি কোনও কথা বলেছিলে?

বজ্রমুকুট বলল—কন্যাকে দেখে আমি এত মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম যে কোনও কথাই মুখ দিয়ে বেরোয় নি। কন্যাটিও কোন কথা আমার সংগে বলে নি।

মন্ত্রীপুত্র বলল—বন্ধু, কেউ কারুর কোনও খবর জান না। ঐ অবস্থায় তোমাদের বিয়ে হওয়া তো অসম্ভব।

সবশুনে রাজপুত্র বজ্রমুকুট শুধু এটুকুই বলল—সেই কন্যাকে যদি না পাই, তবে প্রাণই বিসর্জন দেব।

মন্ত্রীপুত্রের তো হল মুস্কিল। বেচারা করে কি? অনেক ভেবে চিন্তে মন্ত্রীপুত্র বলল—আচ্ছা, কন্যা কি যাবার সময় কোনও সংকেত করেছিল তোমায়?

রাজপুত্র কিছুটা চিন্তা করে বলে রাজকন্যা পদ্মফুল মাথা থেকে নিয়ে, কানে ছুঁইয়ে, পায়ে ফেলেছিল।

কথাটা শুনে মন্ত্রীপুত্র বলল – বন্ধু আর চিন্তা নেই। আমি সেই সংকেতের অর্থ বুঝতে পেরেছি। দেখ, অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের মিলন হবে। অধৈর্য হলে কোনও কাজ সফল হয় না। বরং ধৈর্য ধর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

রাজপুত্র বজ্রমুকুট বলল—তোমার উপদেশ মানছি। কিন্তু তবুও ধৈর্য ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বল ভাই, সংকেতে কি বুঝেছ? কেমন করে সেই কন্যার সংগে আমার মিলন হবে?

মন্ত্রীপুত্র বলল – নাঃ, সত্যিই দেখছি তুমি বড়ই অধৈর্য হয়ে গেছ। শোন তবে, কন্যা পদ্মফুলটি প্রথমে কানে রেখেছিল, অর্থাৎ সংকেত করেছিল আমার বাস কর্নাটনগরে। পদ্মফুলকে দাঁত দিয়ে কেটে বুঝিয়েছিল, আমি দন্তবাট রাজার মেয়ে। পায়ের নিচে পদ্মটি ফেলে সংকেত করেছিল, আমি পদ্মাবতী। আর ফুলটি বুকে তুলে নিয়ে একথাই জানিয়েছিল, আমি তোমার কথা মনের মধ্যে, বুকের মধ্যে রেখে দেব।

মন্ত্রীপুত্রের কাছ থেকে সংকেতের মর্মার্থ জানতে পেরে রাজপুত্র বজ্রমুকুটের আর আনন্দ ধরে না। রাজপুত্র বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে কেবলই বলে—চল বন্ধু, এখনই সেই দন্তবাট রাজার কন্যা পদ্মাবতীর কাছে যাই।

বন্ধুর একান্ত অনুরোধে মন্ত্রীপুত্র তখনই রাজপুত্রকে নিয়ে

কর্নাটনগরের দিকে রওনা হোল। ঘোড়ায় চড়ে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তো চলেছে দু-জনে। যেতে যেতে, শেষে দু-বন্ধু, রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র এসে পৌঁছাল কর্নাটনগরে, দন্তবাট রাজার রাজ্য।

মন্ত্রীপুত্র ভাবতে লাগল, কি করে দন্তবাট রাজার মেয়ের সংগে দেখা করে? দুজনে ঘোড়ার চড়ে আস্তে আস্তে নগরের এপথ-ওপথ দিয়ে যাচ্ছে। এমনি সময়ে চোখে পড়ল মন্ত্রীপুত্রের, এক থুত্থুরে বুড়ী তার বাড়ির সদর দরজার সামনে চুপ করে বসে আছে। মন্ত্রীপুত্র ভাবল এই বুড়ীর যখন এতটা বয়স হোল, রাজ্যের সব খবরই সে নিশ্চয় রাখে। দেখি না একে জিজ্ঞেস করে?

এই ভেবে, দু-জনে ঘোড়া থেকে নেমে বুড়ীর কাছে গিয়ে বলল—বুড়ীমা, আমরা দুজনে বিদেশী পথিক। বাণিজ্য করতে এই দন্তবাট রাজ্যে এসেছি। আমাদের ব্যবসার জিনিসপত্র কদিনের মধ্যেই এসে পড়বে। এই কয়দিন তোমার এখানে থাকতে দেবে?

সুন্দর চেহারার রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্রকে দেখে বুড়ীর ভাল লেগে গেছে। বুড়ী তাই বলল,—থাক না বাছারা এখানে। মনে কর, এটা তোমাদেরই বাড়ি। যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাক।

এরপর রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র ঐ বুড়ীর বাড়িতেই রয়ে গেল। বুড়ীর সংগে মন্ত্রীপুত্র খুব আলাপ জমিয়ে ফেলল। মন্ত্রীপুত্র বলল—বুড়ীমা, তুমি একলাই থাক? কে আছে তোমার? একলা থাকলে সংসার চলে কি করে?

বুড়ী বলল—আমার আছে একই ছেলে। ছেলে কাজ করে

রাজবাড়িতে। রাজা দন্তবাটের খুব প্রিয়পাত্র সে। আর আমি ছিলাম রাজার মেয়ে পদ্মাবতীর ধাত্রী। বুড়ো হয়েছি, তাই বাড়িতেই থাকি, রাজবাড়িতে যেতে হয় না। কিন্তু দয়ালু রাজা দন্তবাট তবুও আমাকে মাসে মাসে মাইনে দেন, অন্ন-বস্ত্র দেন। রাজকন্যাও খুব ভালবাসে আমাকে। তাই দিনে একবার করে গিয়ে রাজকন্যাকে দেখে আসি আমি।

বুড়ীর কথা শুনে রাজপুত্র আর সংযত থাকতে পারল না। বলে উঠল, বুড়ী মা, কাল যখন রাজবাড়িতে রাজকন্যার কাছে যাবে, আমাকে বল। আমি [illegible]কে একটি সংবাদ পাঠাব।

বুড়ী বলল—জরুরী সংবাদ [illegible] ঠিক আছে, সংবাদ বল, এখনই রাজকন্যাকে জানিয়ে আসি।

বুড়ীর এই কথা শুনে রাজপুত্র বড় খুশী। রাজকন্যার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল রাজপুত্র। বলল, রাজকন্যাকে গিয়ে বল বুড়ীমা শুক্লাপঞ্চমীতে, জংগলের মধ্যে, দীঘির পাড়ে যে রাজপুত্রকে দেখেছিলে, সেই রাজপুত্র তার সংকেত মত এখানে এসে পেঁৗছেছে।

বুড়ীমা সব কথা শুনে লাঠিতে ভর করে, টুক্‌টুক করে রওনা হোল রাজবাড়ির দিকে। অন্তঃপুরে গিয়ে বুড়ীমা দেখে, রাজকন্যা পদ্মাবতী একলা, নির্জনে চুপটি করে বসে আছে। বুড়ীমা পদ্মাবতীর কাছে যেতেই পদ্মাবতী বলল,—এসো, এসো ধাই মা। বোস।

বুড়ীমা রাজকন্যাকে আদর করে বলল—পদ্ম, তোকে কত ছোট থেকে মানুষ করে বড় করেছি। তোকে এরকম শুকনো মুখে বসে থাকতে দেখলে বড় কষ্ট হয়। তোর এবার বিয়ে না

দিলে চলছেই না। দাঁড়া, রাজাকে বলে এবার তোর বিয়ের ব্যবস্থা করব।

পদ্মাবতী রেগে বলে– চুপ্ কর ধাইমা। আমি বিয়েই করব না।

রাজকন্যার কথা শুনে বৃদ্ধা ধাইমা ফিক করে হেসে ফেলে। বলে, ভাবিস না, তোর মনের মত লোকের সংগেই তোর বিয়ে দেব। শুক্লাপঞ্চমীতে, জংগলের মধ্যিখানে, সরোবরতীরে দেখা রাজপুত্র তো আমার বাড়িতে এসে হাজির। তোর সংকেত ঠিক বুঝতে পেরেছে। ঐ রাজপুত্রের সংগেই তোর বিয়ে দেব।

বুড়ীমার কথা শুনে, রাজকন্যা ঝাঁ করে উঠে গেল। তারপর, দুহাতে চন্দন মাখিয়ে এসে বুড়ীমার দুই গালে চড় মেরে অন্তঃপুর থেকে তাড়িয়ে দিল।

রাজকন্যা পদ্মাবতীর হঠাৎ এরকম ব্যবহার দেখে বুড়ীমা তো অবাক! সে ধাইমা, আর তাকেই চড় মারা! অপমানিত হয়ে রেগে মেগে, বুড়ী ধাইমা নিজের বাড়িতে ফিরে এসে রাজপুত্রকে বলল– ছিঃ, তোমার জন্য রাজকন্যার কাছে কি অপমানটাই না হোতে হোল!

বুড়ীমার কাছে সবশুনে রাজপুত্র বজ্রমুকুট ভেঙ্গে পড়ল হতাশায়। মন্ত্রীপুত্রকে গিয়ে বলল—না ভাই, তোমার অনুমান ভুল। রাজকন্যা আমাকে একটুও পছন্দ করেন না। তাইতো দুহাতে ধাইমাকে চড় মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বজ্রমুকুটের কাছ থেকে সব শুনে মন্ত্রীপুত্র বলল—বন্ধু, রাজকন্যার সংকেত ধরতে পারনি বলেই তোমরা এসব বলছ। রাজকন্যা তোমাকেই ভালবাসে। সাদা চন্দন দিয়ে ধাইমার দুই

গালে দশটি আঙ্গুলের রেখা এঁকে রাজকন্যা বলেছেন, শুক্লপক্ষ শেষ হোতে বাকী আর দশদিন। ধাইমা, যাও রাজপুত্রকে বোল, এই দশদিন পরেই আমাদের দেখা হবে।
মন্ত্রীপুত্রের কথা শুনে রাজপুত্রের মুখে হাসি ফোটে। ধাইমারও রাগ ঠাণ্ডা হয়। খুশী হয় ধাইমা।

দশদিন পার হোল। শুক্লপক্ষ শেষ হোল। রাজপুত্রের অনুরোধে ধাইমা আবার গেল রাজকন্যার কাছে রাজপুত্রের সংবাদ নিয়ে।
রাজপুত্রের কথা শুনে, রাজকন্যা পদ্মাবতী এবারও রেগে গেল। তাকে ঘাড় ধরে খিড়কির গোপন দরজা দিয়ে রাস্তায় বার করে দিল।
ধাইমা এবারও খুব রেগে গেল। কি? আমায় রাস্তায় বের করে দেওয়া? বাড়িতে ফিরে, রাজপুত্রকে বলল—না বাপু তোমার কথায় পদ্মাবতীর কাছে আর অপমানিত হতে চাই না। এই বলে কি হোল, সব বলল রাজপুত্র বজ্রমুকুটকে। বজ্রমুকুট বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে গিয়ে বলল—বন্ধু, তোমার আশার বাণীতে আর কিছু হবে না। রাজকন্যা আমার নাম শুনেই ধাইমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই বলে, যা ঘটেছে সব বলল।
সবশুনে মন্ত্রীপুত্র বলল, এই কথা? আরে বন্ধু, তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে। রাজকন্যা পদ্মাবতী ধাইমাকে দেখিয়ে দিয়েছে খিড়কির গোপনপথ, যেখান দিয়ে গেলে আজই তোমার সঙ্গে রাজকন্যার দেখা হবে।
মন্ত্রীপুত্রের কথা শুনে রাজপুত্র তো বড় খুশী। ধাইমায়েরও

রাগ ততক্ষণে জল হয়ে গেছে। মন্ত্রীপুত্র বলল—সূর্যাস্তের পর অন্ধকার হলে, তবে যেও রাজকন্যার কাছে।

সূর্যাস্তের পর, অন্ধকার হোলে, মন্ত্রীপুত্র ধাইমাকে নিয়ে, রাজপুত্রকে বরবেশে সাজিয়ে, রাজবাড়ির গোপন খিড়কি দরজায় নিয়ে এল। বলল, যাও বন্ধু, দেখবে তোমার জন্য রাজকন্যা পদ্মাবতী অপেক্ষা করছে। রাজপুত্র বজ্রমুকুট গোপন পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

বজ্রমুকুট অন্তঃপুরে প্রবেশ করে দেখে রাজকন্যা বধূবেশে মালা হাতে, তারই জন্য অপেক্ষা করছে। রাজপুত্র আসতেই সখীরা চারদিক থেকে ফুল ছিটাতে লাগল। সখীদের সাক্ষী রেখে, রাজপুত্রের সঙ্গে মালাবদল করে, রাজকন্যা পদ্মাবতীর গন্ধর্বমতে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর পদ্মাবতী রাজপুত্র বজ্রমুকুটকে কিছুতেই আর ছেড়ে দিল না। কর্ণাটনগরের রাজপ্রাসাদে, রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে গোপনেই রয়ে গেল বজ্রমুকুট। দুজনে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

এমনি করে বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেল। রাজপুত্র বজ্রমুকুটের হঠাৎ মনে পড়ল বন্ধু মন্ত্রীপুত্রের কথা, নিজের দেশের কথা, বাবা-মায়ের কথা। পদ্মাবতীকে মনের কথা জানাল, বলল—অনেকদিন দেশছাড়া। যাই, কিছুদিনের জন্য নিজের দেশ বারাণসীতে ঘুরে আসি। কিন্তু পদ্মাবতী বজ্রমুকুটকে ছেড়ে দিল না। রাজপুত্রকে কর্ণাটনগরের রাজকন্যার কাছেই থেকে যেতে হোল।

এরপর আরও একটা মাস পার হোল। রাজপুত্রের কিন্তু মন সবসময়েই খারাপ হয়ে থাকে। মনে মনে বলে, আমি কি

স্বার্থপর! নিজের সুখের জন্য বাবা-মাকে ছেড়ে, নিজের দেশ ছেড়ে এখানে বসে আছি। আমার জন্য এত যে করল, সেই বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকেও ভুলে গেছি। তার কোনও খবরই রাখি নি।

রাজপুত্রের মনের এই অবস্থা দেখে পদ্মাবতী জিজ্ঞেস করল—সব সময়ে মুখ ভার করে কি চিন্তা কর রাজপুত্র? এখানে কি তোমার ভাল লাগছে না? আমাকে কি আর তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

বজ্রমুকুট—বলল রাজকন্যা, তা নয়। তবে আমি আমার দেশ, বাবা-মাকে ভুলে যত না অপরাধ করেছি, তার চেয়েও বেশি অপরাধ করেছি বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে ভুলে। বেচারা আমার জন্য দেশ ছেড়ে, তার বাবা-মাকে ছেড়ে এসেছে। মন্ত্রীপুত্রই তো তোমার সংকেতের মানে বুঝিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, তোমার সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়েছে। অথচ দেখ, এই কয়মাস বন্ধুর কোন খবরই রাখি নি। বন্ধুর চিন্তাই আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সব শুনে কর্ণাটনগরের রাজকন্যা পদ্মাবতী বুঝল, বন্ধু মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে দেখা না করতে দিলে রাজপুত্রের মনে সুখ আসবে না। তাই বলল—সত্যিই তো, এরকম প্রিয় বন্ধুকে ভুলে থাকা অসম্ভব। তার জন্য কষ্ট হওয়াই উচিত। তুমি যাও, তার সঙ্গে দেখা করে আস। আর তাকে খুশী করার জন্য আমি নিজ মিষ্টান্ন বানিয়ে পাঠাচ্ছি।

রাজপুত্র খুশীমনে ফিরে গেল ধাইমার বাড়িতে, বন্ধু মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য। দু-বন্ধুর মিলন হওয়াতে দুজনের আর আনন্দের সীমা রইল না। রাজপুত্র এই কয়মাসের সব ঘটনা মন্ত্রীপুত্রকে বলল।

এদিকে, রাজপুত্র চলে যেতেই রাজকন্যা পদ্মাবতী ভাবতে শুরু করল, মন্ত্রীপুত্রের সাহায্যে, বুদ্ধিতেই রাজপুত্র আর আমার মিলন সম্ভব হয়েছে। তাই দুই বন্ধুর দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, মন্ত্রীপুত্রকে আমাদের গন্ধর্বমতে গোপন বিয়ের কথা নিশ্চয়ই জানাবে রাজপুত্র। মন্ত্রীপুত্র তখন বাহাদুরী নেবার জন্য অন্যান্য লোকজনদেরও নিশ্চয়ই সবকিছু বলবে। ফলে আমাদের গোপন বিয়ের কথা আমার বাবা, এই কর্ণাটরাজার কানে উঠবে। ফলে আমাদের বিপদ হবে। তাই মন্ত্রীপুত্র বেঁচে থাকলে আমার আর রাজপুত্রের বিপদই হবে। সেজন্য বুদ্ধি করে মন্ত্রীপুত্রকে মেরে ফেলতে হবে।

এই ভেবে, রাজকন্যা, বিষ দিয়ে সুমিষ্ট খাবার তৈরি করে, সখীদের হাত দিয়ে মন্ত্রীপুত্রের কাছে পাঠাল। রাজকন্যা আগেই জেনেছিল বজ্রমুকুটের কাছ থেকে যে, মন্ত্রীপুত্র আছে ধাইমার বাড়িতে।

হঠাৎ সুমিষ্ট পিঠে নিয়ে রাজকন্যার সখীরা আসতে অবাক হোল মন্ত্রীপুত্র। বলল—বন্ধু রাজপুত্র, হঠাৎ এইসব মিষ্টান্ন কেন?

রাজপুত্র বলল—তোমার জন্য আমার এত চিন্তা দেখে তোমার রাগ ভাঙ্গাবার জন্য রাজকন্যা নিজে এসব তৈরি করে পাঠিয়েছে। বন্ধু, তুমি খাবার খেয়ে খুশী হলে, আমি রাজকন্যাকে জানাতে পারব, তোমার আর আমাদের ওপর রাগ নেই। বন্ধু, নাও, আমার সামনে মিষ্টান্ন খাও। রাজকন্যার সখীরা ততক্ষণে খাবার দিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেছে।

মন্ত্রীপুত্র কিছুক্ষণ চিন্তা করল। ভাবল, হঠাৎ তাকে কেন

খুশী করতে চাইবে রাজকন্যা? কিছু ভেবেই বুঝতে পারল মন্ত্রীপুত্র, রাজকন্যা চায় না তার সংগে রাজপুত্রের এত বন্ধুত্ব থাকুক। তাহলে রাজকন্যা কোনও দিনই সম্পূর্ণ ভাবে রাজপুত্রকে পাবে না। সেজন্যই তাকে সরাবর জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। মন্ত্রীপুত্র তাই বলল – বন্ধু রাজপুত্র, রাজকন্যা শুধু মিষ্টিই পাঠায় নি, তার সংগে নিশ্চয়ই বিষও মিশিয়ে আমাকে সরাতে চাইছে। ভাগ্য ভাল যে এই মিষ্টান্ন তুমি খাও নি। তাহলে তুমি নিশ্চয়ই এতক্ষণে মারা যেতে।

একথা শুনে রাজপুত্র রেগে গেল। বলল—নাঃ, নাঃ, এসব মিথ্যে কথা। তুমি শুধু শুধু রাজকন্যার বদনাম করছ। এই দেখ, তোমার মিথ্যে সন্দেহ এখনই দূর করছি। এই বলে ধাইমার পোষা বিড়াল যেটা সামনে ঘুরঘুর করছিল, তাকে কয়েকটা মিষ্টি খেতে দিল। বেড়াল বিষ মেশানো মিষ্টি খেয়ে তক্ষুনি মারা গেল।

এই ব্যাপার দেখে রাজপুত্র তো বিস্ময়ে অবাক। সত্যিই তো বিষ মিশিয়ে বন্ধুকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল পদ্মাবতী! উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল বজ্রমুকুট—নাঃ, ঐরকম পাপিষ্ঠ মেয়ের আর আমি মুখ দেখছি না। পদ্মাবতীকে আমি ত্যাগ করব।

মন্ত্রীপুত্র বলল—না বন্ধু, সেটা করলে আমাদের দুজনেরই বিপদ হবে। ভুলো না পদ্মাবতী তোমার স্ত্রী। তাই বুদ্ধির কৌশলে রাজকন্যাকে এরাজ্য থেকে বরং আমাদের রাজ্যে নিয়ে যেতে হবে।

রাজপুত্র শুনে বলল—তুমি যা বলবে তাই করব বন্ধু।

তোমার পরামর্শে আমার ভালই হয়েছে, তাই যে পরামর্শ দেবে তাই শুনব।

—বন্ধু, শোন তাহলে। তুমি রাজকন্যার কাছে ফিরে যাও। গিয়ে বল, তোমার পাঠান মিষ্টি খেয়ে মন্ত্রীপুত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। মন্ত্রীপুত্রের ঘুম ভাঙ্গছে না, অথচ রাজকন্যাকে বেশি ক্ষণ ছেড়ে থাকাও সম্ভব নয়, তাই মন্ত্রীপুত্রকে ঐ অবস্থায় রেখেই চলে এসেছি। এরপর রাত্রে যখন রাজকন্যা ঘুমিয়ে পড়বে, তখন রাজকন্যার সমস্ত গহনা খুলে, বাম জংঘায় ত্রিশূল চিহ্ন এঁকে, রাজকন্যার সমস্ত-গহনা নিয়ে এখানে চলে আসবে। তারপর যা করার আমি করব।

মন্ত্রীপুত্রের কথামত কাজ করল বজ্রমুকুট। ফিরে গেল পদ্মাবতীর কাছে। যে ভাবে বলতে বলেছিল তাই বলল। সব শুনে রাজকন্যা তো মহাখুশী। ভাবল, যাক, মন্ত্রীপুত্র শেষ হয়েছে। এবার রাজপুত্র সব সময়েই তার কাছে থাকবে। খুশী মনে, সেদিন বজ্রমুকুটের সংগে আনন্দ করে দিন কাটাল পদ্মাবতী। এরপর রাত্রে পদ্মাবতী ঘুমাবার পর তার গায়ের সমস্ত দামী দামী গয়নাগাটি খুলে, বাম জংঘায় ত্রিশূল চিহ্ন এঁকে খিড়কির গোপন দরজা দিয়ে পালিয়ে এল রাজপুত্র। সোজা চলে এল ধাইমার বাড়িতে, মন্ত্রীপুত্রের কাছে। ধাইমা কিন্তু এই গহনা চুরির ব্যপার-স্যাপার, কিছুই জানল না।

এরপর মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রকে নিয়ে শ্মাশানে চলে এল। ছাই-ভস্ম মেখে, মন্ত্রীপুত্র যোগী সাজল, আর রাজপুত্রকে শিষ্য সাজাল। তারপর বলল—বন্ধু, এইবার কাল তুমি শহরে গিয়ে রাজকন্যার গহনাগুলো বিক্রী কর। কেউ যদি তোমাকে চোর বলে ধরে,

তবে বলবে, এসব আমাকে আমার গুরু দিয়েছে। তারপর আমার কাছে তাকে নিয়ে আসবে।

পরের দিন সকালে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রের কথামত শহরে গেল গহনাগুলো বিক্রী করতে। স্যাকরা গহনা দেখেই বুঝতে পারল এসব রাজবাড়ির গহনা। সেইতো এগুলো বানিয়ে রাজবাড়ীতে দিয়ে এসেছিল। স্বর্ণকারের সন্দেহ হল। রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করল—এই সব গহনা পেলে কোত্থেকে ? এতো রাজকন্যার গহনা। মন্ত্রীপুত্রের শেখানো কথমত বজ্রমুকুট বলল—এসব রাজকন্যার গনহ হবে কেন ? এগুলো তো গুরুদেব আমাকে দিয়েছেন বিক্রী করার জন্য। তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন তিনিই জানেন। চল না, গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করবে।

এইসব কথাবার্তায় দোকানের সামনে লোকজন জমে ভীড় হয়ে গেল। ক্রমে নগরপালের কাছে এই খবর গেল। নগরপালের লোক এসে সব শুনে রাজপুত্রকে নিয়ে শ্মশানে এল, ধরল ছদ্মবেশী মন্ত্রীপুত্রকে। বলল—যোগী, তুই রাজবাড়ি থেকে এসব চুরি করেছিস। বলে যোগীকে ধরে নিয়ে এল কর্ণাটরাজ দন্তবাটের কাছে।

রাজা দন্তবাট জিজ্ঞেস করলেন—যোগী, রাজবাড়ির এই অলঙ্কার আপনি পেলেন কি করে ?

যোগীবেশী মন্ত্রীপুত্র বলল—দেখুন রাজা, গত কৃষ্ণাচতুর্দশীতে, নগরের শেষে, শ্মশানে বসে যখন ডাকিনীমন্ত্র যোগে তন্ত্রসাধনা করছিলাম, তখন মন্ত্রবলে ডাকিনী নিজে আসে সেখানে। তন্ত্রসিদ্ধি-উদ্দেশে ডাকিনী এইসব অলংকার প্রণামী দিয়ে যায়। আমার শিষ্যা হবার পর ডাকিনীর বাম জংঘায় আমি ত্রিশূল চিহ্ন

এঁকে দিই, শিষ্যার চিহ্ন হিসাবে। রাজকন্যা-টন্যাকে আমি চিনি না, জানিও না।

যোগীবেশী মন্ত্রীপুত্রের কথায় রাজা দন্তবাট অবাক হয়ে যান। দ্রুত রাজ-অন্তঃপুরে চলে যান। রাজমহিষীকে বলেন—যাও তো, রাজকন্যাকে একবার পরখ করে এসো।

রাণী রাজকন্যাকে পরীক্ষা করে ফিরে এসে বিস্ময়ে বলেন—মহারাজ। আশ্চর্য ব্যাপার! রাজকন্যার বাম জঙ্ঘায় সত্যিই ত্রিশূল চিহ্ন! বিশ্বাস করুন, ছোট বেলায় এই চিহ্ন রাজকন্যার শরীরে ছিল না।

রাণীর কথা শুনে রাজা দন্তবাট লজ্জায় মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলেন—রাজকন্যা তাহলে ডাকিনী! নাঃ, ডাকিনী মেয়েকে ঘরে রাখা ঠিক নয়। এতে রাজ্যের অকল্যাণ হতে পারে। কিন্তু কি করব, কার পরামর্শ নেব? শেষে রাজা দন্তবাট ভেবে চিন্তে স্থির করলেন, রাজকন্যার এই লজ্জার গোপন কথা যখন আর কাউকে বলা যাবে না, তখন এই যোগীকে জিজ্ঞেস করাই শ্রেয়।

এই ভেবে রাজা দন্তবাট রাজসভায় ফিরে এলেন। গোপনে যোগী-বেশী মন্ত্রিপুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন—যোগী, রাজকন্যাই আপনার মন্ত্রশিষ্যা সেই ডাকিনী। বলুন, ডাকিনী মেয়েকে কি করা উচিত?

যোগীবেশী মন্ত্রীপুত্র বলল—মহারাজ, ডাকিনী থেকে আপনার দূরে থাকাই উচিত। আর, শাস্ত্রেই আছে স্ত্রীলোককে বধ করা নিয়ম বিরুদ্ধ। তাই এই ডাকিনী রাজকন্যাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়াই সঠিক কাজ হবে।

যোগীর পরামর্শমত রাজা দন্তবাট রাজকন্যার নির্বাসন দণ্ড দিলেন। পদ্মাবতীকে পাল্কীতে চড়িয়ে রাজ্যর প্রান্তে, গভীর জংগলে ছেড়ে এল পাল্কী বাহকরা।

এদিকে রাজা দন্তবাটকে পরামর্শ দিয়েই যোগীবেশী মন্ত্রীপুত্র ফিরে এল শ্মশানে। রাজপুত্র বজ্রমুকুটকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে দুজনে দ্রুত চলে এল জংগলে। খুঁজে খুঁজে বনে, রাজকন্যা পদ্মাবতীকে বের করল, রাজকন্যা পদ্মাবতী তো জানে না কেন হঠাৎ রাজা দন্তবাট তাকে নির্জন বনে নির্বাসন দিলেন। বেচারা তাই নির্জন বসে বসে কেঁদেই চলেছে।

এই সময় রাজপুত্র বজ্রমুকুট আর মন্ত্রীপুত্র সেখানে উপস্থিত। বজ্রমুকুট রাজকন্যা পদ্মাবতীকে ঘোড়ায় উঠিয়ে নিজের রাজ্যে বারাণসীতে ফিরে চলল। মন্ত্রীপুত্রও তাদের সংগে চলল।

রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র দীর্ঘদিন পরে রাজ্যে ফেরাতে সব্বাই হৈ-চৈ, আনন্দ করে উঠল। রাজপুত্র রাজকন্যাসহ ফেরাতে বারাণসীরাজ প্রতাপমুকুট আরও খুশী হলেন। বজ্রমুকুট আর পদ্মাবতীকে আশীর্বাদ করলেন। রাজ্যে মহোৎসব আনন্দ শুরু হোল।

বেতালের গল্প শেষ হোল। গল্পশেষে বেতাল জিজ্ঞেস করল—মহারাজ, বিনা অপরাধে রাজকন্যার এই নির্বাসনের জন্য কে দায়ী, রাজপুত্র, না মন্ত্রীপুত্র ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—আমার মতে, এদের দুজনের কেউই নয়। দায়ী রাজা দন্তবাট।

— কেন ? বেতাল প্রশ্ন করল।

বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন—মন্ত্রীপুত্রকে রাজকন্যা পদ্মাবতী

বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তাই মন্ত্রীপুত্রের কাছে রাজকন্যা শত্রু। আর শাস্ত্রেই আছে, শত্রুকে বধ করলে, বা, তার ওপর প্রতিশোধ নিলে তা অন্যায় হয় না। তাই পদ্মাবতীর সংগে এরকম ব্যবহার, মন্ত্রীপুত্রের পক্ষে অন্যায় নয়। আর উপকারী বন্ধুর পরামর্শে চলা রাজপুত্রের পক্ষেও দোষণীয় নয়। কিন্তু অজানা অচেনা লোকের কথায় ভুলে, তাকে বিশ্বাস করে, এককথায় নিজের মেয়েকে নির্বাসন দেওয়া ঘোরতর অন্যায়। রাজা দন্তবাটের উচিত ছিল ভালভাবে সব বিচার করা, রাজকন্যাকে তার নির্দোষিতা প্রমাণের সুযোগ দেওয়া। এইসব না করায় রাজা দন্তবাট রাজধর্ম-বিরুদ্ধ কাজ করেছেন। ফলে রাজা দন্তবাট পাপের ভাগী হয়েছেন।

সঠিক উত্তর হওয়ায় বেতাল প্রতিজ্ঞামত শ্মশানে ফিরে গিয়ে শিরীষ গাছের ডালে আগের মতই ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছন পিছন ছুটে শিরীষগাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে আবার আগের মতই কাঁধে ফেলে চলতে লাগলেন।

বেতালও তখন শুরু করল দ্বিতীয় গল্প.......................

বেতালের দ্বিতীয় গল্প
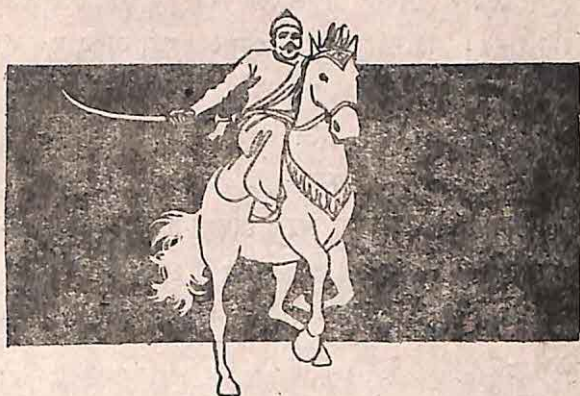
বেতাল বলল—মহারাজ্, শোন তবে দ্বিতীয় গল্প—

যমুনার তীরে জয়স্থল নামে এক সুন্দর শহর ছিল। সেই শহরে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন, নাম কেশব। এই ব্রাহ্মণ কেশবের মধুমালতী নামে এক পরমা সুন্দরী, রূপবতী-গুণবতী মেয়ে ছিল্। মেয়ে ধীরে ধীরে বড় হল, বিয়ের বয়স হল। তখন, ব্রাহ্মণ কেশব, আর ব্রাহ্মণের বড় ছেলে, মধুমালতীর জন্য পাত্র খুঁজতে লাগল। বড় মেয়েকে তো আর বিয়ে না দিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখা যায় না?

এমনি সময়ে একদিন, ব্রাহ্মণ কেশবকে তার এক যজমানের ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে অন্য গ্রামে যেতে হোল। ওদিকে ব্রাহ্মণের বড় ছেলেও লেখাপড়া শেখার জন্য, অন্যদেশে, গুরুগৃহে চলে গেল। ব্রাহ্মণ আর তার ছেলে বাড়ি ছেড়ে অন্যগ্রামে যাওয়ার পরই

ত্রিবিক্রম নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলে এসে উপস্থিত হোল কেশব-ব্রাহ্মণের বাড়িতে।

ত্রিবিক্রম দেখতে যেমন রাজপুত্রের মত সুন্দর, বিদ্যাবুদ্ধিও তেমনি প্রখর। ত্রিবিক্রমকে দেখে কেশবের স্ত্রী ভাবলেন—আহা, এমন সুন্দর ব্রাহ্মণের ছেলে! যদি ত্রিবিক্রম ভালবংশে জন্মে থাকে তবে মধুমালতীর সংগে এর বিয়ে দেব। মধুমালতীকে নিশ্চয়ই পছন্দ করবে ত্রিবিক্রম।

এইসব নানান কিছু চিন্তা করে ব্রাহ্মণী ত্রিবিক্রমকে আদর-যত্নে বাড়িতে রাখলেন। কথায় কথায় ব্রাহ্মণী জেনে নিলেন, ত্রিবিক্রম ভাল উঁচু বংশের ছেলে। এই কথাটা জানার পর ব্রাহ্মণী ত্রিবিক্রমকে বললেন—হ্যাগো বাছা, তুমি তো আমার মেয়ে মধুমালতীকে দেখেছ? তাকে পছন্দ হয়? বিয়ে করবে আমার মেয়েকে?

ত্রিবিক্রম তো এদিকে মধুমালতীকে আগেই দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিল। ত্রিবিক্রমেরও ইচ্ছে ছিল মধুমালতীকে বিয়ে করার। তাই ব্রাহ্মণীর প্রস্তাবে এক কথায় রাজী হয়ে গেল। ত্রিবিক্রম ব্রাহ্মণের ঘরে থেকে গেল আর অপেক্ষা করতে লাগল কবে ব্রাহ্মণ কেশব ফিরে আসেন। ব্রাহ্মণের অজান্তে তো আর এই বিয়ে হতে পারে না? তাই উদ্বেগ নিয়ে ত্রিবিক্রম অপেক্ষা করতে লাগল ব্রাহ্মণের বাড়িতে।

এদিকে হোল কি, কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণ কেশব তার ছেলে দুজনেই একটি করে পাত্র নিয়ে ফিরে এল মধুমালতীর জন্য। পাত্র দুটির নাম বামন আর মধুসূদন। কেশব আর তার পুত্র দুজনেই পাত্রদের কথা দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন যে তাদের সংগেই মধু-মালতীর বিয়ে দেবে।

ফলে বিরাট সমস্যা দেখা দিল। ত্রিবিক্রম, বামন আর মধুসূদন তিনটি রূপবান-গুণবান পাত্র উপস্থিত। মধুমালতীর সংগে বিয়ে হবে, এই কথা তিনজনেই পেয়েছে। কিন্তু এ অবস্থায় কার সংগে মধুমালতীর হবে ? ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-পত্নী, ব্রাহ্মণ-পুত্র তিনজনের মধ্যে দুজনের বাগ্‌দান মিথ্যে হবে যখন একজনের সংগে মধুমালতীর বিয়ে হয়ে যাবে। চিন্তায় মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে থাকেন ব্রাহ্মণ।

ঠিক এমনি সময়ে ব্রাহ্মণী বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে এসে বললেন —ব্রাহ্মণ। মহা সর্বনাশ হয়েছে ! মধুমালতীকে সাপে কামড়েছে। —সে কি! ব্রাহ্মণ এই কথা বলে সাপের ওঝাকে আনতে ছুটলেন। চার-পাচজন বৈদ্য, নামী ওঝা সবাই এল। কিন্তু সব চেষ্টা বিফল হল। বৈদ্যরা, ওঝারা বলল– নাঃ, একে বাঁচান গেল না। কালনাগিনীর দংশন, শিবের অসাধ্য। মধুমালতীর মৃত্যু হোল সর্পদংশনে।

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণপুত্র আর মধুমালতীর তিন পাত্র, ত্রিবিক্রম, বামন আর মধুসূদন এই পাঁচজনে মিলে মধুমালতীর মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলল।

তিনজন পাত্রই মধুমালতীকে দেখে তাকেই বিয়ে করবে স্থির করে ফেলেছিল। এখন, হঠাৎ এইভাবে মধুমালতী মারা যাওয়ায় তিনজনেরই খুব দুঃখ হোল। তিনজনেই ঠিক করে ফেলল বিবাগী হবে, সংসারে আর তারা ফিরেব না।

এইভেবে, ত্রিবিক্রম চিতা থেকে মধুমালতীর একটি অস্থি তুলে নিয়ে, অস্থিকে মধুমালতীর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে সংগে নিল। আর তারপর দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দ্বিতীয় পাত্র বামন মন শান্ত করার জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর তৃতীয় পাত্র মধুসূদন চিতাভস্ম সংগ্রহ করে শ্মশানের পাশেই ছোট্ট কুটির বানিয়ে, সেখানে চিতাভস্ম রেখে, সেই চিতাভস্মের সাধনা করতে লাগল।

এইভাবে বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেল। এমনি সময়ে একদিন, ঘুরতে ঘুরতে দুপুরবেলায় এক ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হল। দুপুরবেলায় অতিথিকে দেখে ব্রাহ্মণ সাদরে বামনকে ভিতরে নিয়ে এল, বলল—অতিথি ভগবান। তাই আপনি ভগবানতুল্য। দয়া করে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে যখন এসেছেন, তখন দুপুরের আহার গ্রহণ করে আমাদের ধন্য করুন।

গৃহস্থের কথায় বামন সেখানে দুপুরের আহার করতে বসল। গৃহস্থের ব্রাহ্মণী, বামনকে খাবার পরিবেশন করতে লাগলেন। এদিকে ঠিক সেই সময়ে, ব্রাহ্মণের বছর পাঁচেকের ছেলে সেখানে এসে হৈ-হট্টগোল উৎপাত আরম্ভ করল। ব্রাহ্মণী কত করে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলেন ছেলেকে। কিন্তু দুষ্টু ছেলে কিছুতেই শান্ত হোল না। শেষে, বিরক্ত হয়ে রেগে ব্রাহ্মণী ছেলেকে দুহাতে তুলে জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে ফেলে দিলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আবার খাবার পরিবেশন শুরু করলেন।

বীভৎস এই ব্যাপার দেখে বামন তো চমকে উঠল। দুপুরের খাওয়া সেখানেই তার বন্ধ হয়ে গেল। বহুক্ষণ বিস্ময়ে চুপচাপ বসে থাকল বামন।

বামনকে খাওয়া বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ বললেন—একি !, খাওয়া বন্ধ করলেন কেন ?

বামন বলল—জলজ্যান্ত ছেলেকে উনুনে ফেলে পুড়িয়ে মারলেন ব্রাহ্মণী ! তাই দেখে কেউ আর খেতে পারে ?

রেগে ব্রাহ্মণী ছেলেকে দুহাতে তুলে জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে ফেলে দিল।

গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ কথাটা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন —নাঃ, নাঃ, এর মধ্যে বীভৎস কিছু নেই। এই বলে, পাশের ঘরের থেকে নিয়ে এলেন সঞ্জীবনী-বিদ্যার পুঁথি। পুঁথি খুলে তার থেকে সঞ্জীবনী মন্ত্র বার করে তিনবার জপ করলেন। ব্রাহ্মণের ছেলে জীবন্ত হয়ে উঠল, পোড়া ছাই থেকে। জীবন্ত হয়েই ব্রাহ্মণের ছোট ছেলেটা আগের মতই হৈ-চৈ-দুষ্টুমি শুরু করল। বামন সব দেখে অবাক। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মানুষও সঞ্জীবনী মন্ত্রে বেঁচে ওঠে! খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর বামন বার বার ভাবতে থাকে, ইস ঐ সঞ্জীবনী-মন্ত্রের বইটা পেলে মন্ত্র বলে মধুমালতীর ছাই হয়ে যাওয়া শরীরটাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি। অনেক ভেবে চিন্তে বামন স্থিরই করে ফেলল, যে ভাবেই হোক্ ঐ সঞ্জীবনীর মন্ত্র বইটাকে হস্তগত করতেই হবে।

এই চিন্তা করে বামন ফন্দি আঁটল যাতে সে রাত্রে গৃহস্থের বাড়িতে থেকে যেতে পারে। নানান কথা-বার্তায় যখন বিকেল হয়ে গেল, তখন বামন বলল—বেলা পড়ে সন্ধে হয়ে এল। এই সময়ে অন্য জায়গায় যাওয়া মুস্কিল। ভাবছি আজকের রাত্রে আপনার বাড়িতেই থেকে যাই।

অতিথি নিজে থাকতে চাইছে, এতো খুব আনন্দের কথা। গৃহস্থ খুব সমাদরে বামনের থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

তারপর, রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর যখন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন বামন আস্তে আস্তে সেই ঘরটায় ঢুকে সঞ্জীবনী-বিদ্যার পুঁথিটা নিয়ে দ্রুত জয়স্থলের দিকে রওনা হল। দ্রুত চলতে চলতে, কিছুদিনের মধ্যেই বামন এসে পেঁছাল জয়স্থলের শ্মশানে। শ্মশানে পেঁাছিয়ে বামন দেখে, শ্মশানের

গায়েই ছোট্ট পাতা-ছাওয়া কুটির বানিয়ে মধুসূদন সেখানে যোগসাধনা করছে। বামন যখন মধুসূদনের পাশে এসে বসেছে তখন ঠিক সেই সময়ে ত্রিবিক্রমও হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হল।

তিনজনে যখন নানান কথাবার্তা শুরু করেছে তখন বামন বলে উঠল জান, আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা জানি। মধুমালতীর অস্থি-ভস্ম নিয়ে এস, আমি মন্ত্র পড়ে মধুমালতীকে বাঁচিয়ে তুলব।

বামনের এই কথা শুনে ত্রিবিক্রম তার কাছে রাখা মধুমালতীর অস্থি আর মধুসূদন তার কাছে রাখা ভস্ম একত্রিত করে রাখল বামনের সামনে। তারপর বামন সঞ্জীবনী মন্ত্র পড়তেই মধুমালতী বেঁচে উঠল।

মধুমালতী বেঁচে উঠতেই বামন ত্রিবিক্রম আর মধুসূদন তিনজনেই বলে উঠল—আমিই মধুমালতীকে বিয়ে করব। এরপরেই শুরু হল তিনজনের ঝগড়া। তিনজনেই বলে, মধুমালতীকে বিয়ে সেই করবে।

এতদূর গল্প বলার পর বেতাল জিজ্ঞাসা করল বিক্রমাদিত্যকে—বল তো রাজা এই তিনজন পাত্রের মধ্যে মধুমালতীকে বিয়ে করার অধিকারী কে?

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বললেন—শ্মশানের ধারে কুটির বানিয়ে, চিতাভস্মকে নিয়ে যিনি সাধনা করছিলেন, একমাত্র তিনিই মধুমালতীকে বিয়ে করতে পারেন।

—কেন? বামন সঞ্জীবনী বিদ্যার জোরে মধুমালতীকে বাঁচিয়েছে। ত্রিবিক্রম অস্থি রেখে দিয়েছিল বলে সেই অস্থিতে

সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করেছে বামন। তাহলে, বামন বা ত্রিবিক্রম কেন অধিকারী হবে না ?

বিক্রমাদিত্য বললেন—মধুমালতী প্রাণ ফিরে পেয়েছেন বামন-ত্রিবিক্রম-মধুসূদন তিনজনের জন্যই, এটা ঠিক। তবে অস্থি সংগ্রহ করে রাখে পুত্রস্থানীয়রা। তাই অস্থি সংগ্রহ করে ত্রিবিক্রম হয়েছেন মধুমালতীর পুত্রস্থানীয়। জীবনদান করে পিতৃস্থানীয় হয়েছেন বামন। ফলেই যিনি শুধু ভস্ম সংগ্রহ করেছিলেন, সেই মধুসূদনই মধুমালতীকে বিয়ে করার একমাত্র অধিকারী হয়েছেন।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল প্রতিজ্ঞামত শ্মশানে ফিরে গিয়ে শিরীষ গাছের ডালে, আগের মতই প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছন পিছন ছুটে শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে আগের মতই কাঁধে ফেলে চলতে লাগলেন।

বেতালও তখন শুরু করল তৃতীয় গল্প······

বেতালের তৃতীয় গল্প

বেতাল বলল,—মহারাজ শোন তবে তৃতীয় গল্প—

রূপসেন ছিলেন বর্ধমান নগরের রাজা। খুব বিদ্বান, দয়ালু, ধার্মিক আর গুণগ্রাহী রাজা। এই রাজা রূপসেনের রাজ দরবারে বীরবর নামে এক রাজপুত এল কর্মপ্রার্থী হয়ে। দ্বাররক্ষী এসে বীরবরের কথা জানাল রাজাকে। রাজা রূপসেন সব শুনে বললেন—আনো কর্মপ্রার্থী রাজপুত যুবককে।

দ্বাররক্ষী রাজার আদেশ পেয়ে বীরবরকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করল। অশ্রুধারা, দীর্ঘকায় যুবককে দেখে রাজা খুশী হলেন। বুঝলেন এই ছেলেটা বেশ কাজের হবে। রাজা তখন জিজ্ঞেস করলেন—বীরবর—,বল কত টাকা মাইনে হলে তুমি সুখে দিন কাটাতে পার?

বীরবর মুহূর্তে চিন্তা না করেই বলল—মহারাজ, প্রতিদিন

এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পেলে আমি সহজে দিনপাত করতে পারি। রাজা রূপসেন বীরবরের কথা শুনেতো অবাক! এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রতিদিনের মাইনে! রাজা ব্যাপার বোঝার জন্য তাই জিজ্ঞেস করলেন– এত মাইনে চাইছ? তোমার পরিবারের লোকজনের সংখ্যা কত?

বীরবর আস্তে আস্তে বলল—মাত্র চারজন। এক ছেলে, এক মেয়ে আর আমরা স্বামী-স্ত্রী, ব্যাস, এই চারজন।

বীরবরের কথা শুনে রাজা আরও অবাক হলেন। ভাবলেন, ছোট চারজনের পরিবারের দিনে খরচা লাগে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা! নাঃ নিশ্চয়ই এর মধ্যে আরও কিছু ব্যাপার আছে! সামান্য কর্মচারীকে এত টাকা মাইনে দেওয়া সঠিক হচ্ছে না জেনেও, রাজা রূপসেন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায় বীরবরকে নিযুক্ত করলেন। মনে মনে চিন্তা করলেন যে লোক এত টাকা মাইনে চায়, নিশ্চয়ই তার বিশেষ কিছু গুণ, বা ক্ষমতা আছে, তা না হলে নির্ভয়ে এত বেশি টাকা মাইনে চাইবে কেন? দেখতে হবে গোপনে বীর-বরের সেই বিশেষ গুণ কি?

বীরবর তো নিযুক্ত হল রাজা রূপসেনের রাজপ্রাসাদের রাজরক্ষী হিসাবে। রাজা কোষাধ্যক্ষকে হুকুম দিলেন, বীরবর যেন প্রতিদিন সকাল এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা মাইনে পায়।

বীরবর রাজার হুকুমমত এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা মাইনে পেয়েই সেটা নিয়ে সোজা বাড়ি গেল। তারপর সেই মুদ্রাকে অর্দ্ধেক করে, পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা নানান ব্রাহ্মণকে দান করল। তারপর বাকী অর্ধেক মুদ্রাকে আবার অর্ধেক করে সেই আড়াইশো স্বর্ণমুদ্রা সাধু-সন্ন্যাসীদের দান করল। শেষে অবশিষ্ট

আড়াইশো স্বর্ণমুদ্রায় নানান খাবার কিনে শতশত গরীব দুঃখীদের খাওয়ালো। গরীব-দুঃখীদের খাওয়াবার পর যা কিছু সামান্য খাবার থাকল, তাই দিয়ে ছেলে-মেয়ে—বৌ ও নিজে খেল।

এইভাবে বীরবর সমস্ত অর্থ দান-ধ্যান করে গরীব দুঃখীদের খাইয়ে, শেষে সন্ধ্যাবেলায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, বর্ম-খড়্গ চর্ম ধারণ করে, রাজপ্রাসাদের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হল। সমস্ত রাত রাজ-প্রাসাদের সিংহদ্বার পাহারা দিতে লাগল। রাজা প্রভুভক্তি ও শক্তি পরীক্ষা করার জন্য মধ্য রাত্রিতে এমনকি রাতের দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রহরেও যখন যা আদেশ করেন বীরবর অসম্ভব হলেও সে আদেশকে পালন করে। রাজা রূপসেন বীরবরের শক্তি ও প্রভুভক্তিতে খুশী হয়ে উঠেন।

এমনি করেই বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে। এমনি সময়ে একদিন গভীর রাতে এক স্ত্রীলোকের কান্না ভেসে এল। কান্না শুনতে পেয়ে রূপসেন ডেকে পাঠালেন বীরবরকে।

বীরবর রাজার কাছে এসে বলল – বলুন মহারাজ, কি আদেশ ?

রূপসেন বললেন—দেখতো, এই মাঝরাতে কাঁদে কে ? কেনই বা কাঁদে ? কান্নাটা শুনতে পেলাম ভেসে আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। যাও, তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে আমাকে জানাও তো।

বীরবর মাথা নিচু করে বলল – ঠিক আছে মহারাজ, সবকিছুর খবর এখনই নিয়ে আসছি। এই বলে বীরবর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে এল।

রাজা বীরবরের এই আজ্ঞানুবর্তিতা দেখে খুশী হলেন। সংগে সংগে ভাবলেন, যাই, দেখেই আসি, বীরবর কোথায় যাচ্ছে, কি করছে? এই চিন্তা করে রাজা রূপসেনও বীরবরকে গোপনে অনুসরণ করতে লাগলেন।

—তুমি কে গো মেয়ে?

এদিকে বীরবর রাজপ্রাসাদের দক্ষিণে যেতে যেতে শেষে এসে উপস্থিত হল এক বিরাট ভয়ঙ্কর শ্মশানে। শ্মশানের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে বীরবর দেখে, এক অপরূপা সুন্দরী স্ত্রীলোক, সর্বাংগে বহুমূল্য অলংকার পরে, কপালে আঘাত করছে আর উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করে কাঁদছে।

শ্মশানে, সুন্দরী মহিলা, সেজেগুজে, অলংকার পরে এমন করে কাদছে! একি! অবাক্ হয়ে যায় বীরবর। মেয়েটির কাছে গিয়ে বীরবর জিজ্ঞেস করে, কে গো তুমি? এই ভয়ংকর শ্মশানে রাতে একলা বসে কাঁদছ কেন?

বীরবরের কথার কোনও উত্তর না করে আরও জোরে কেঁদে উঠল সুন্দরী মেয়েটা।

বীরবর তখন বারবার অনুনয়-বিনয় করে জিজ্ঞেস করল, বল মেয়ে, কাঁদছ কেন? তোমার কিসের দুঃখ?

বীরবরের একান্ত অনুরোধে স্ত্রীলোকটি এবার বলল, আমি এই রাজ্যের রাজলক্ষ্মী। রাজা রূপসেনের রাজপ্রাসাদে নানান্ অন্যায় আচরণ হচ্ছে। আর সেজন্য এই রাজ্যে, কিছুদিনের মধ্যেই অলক্ষ্মী এসে ঢুকবে। অলক্ষ্মী আসলে আমাকে তো রাজাকে ছেড়ে যেতেই হবে। আর রাজাকে ছেড়ে আমি চলে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে রাজার মৃত্যু হবে। এইসব ঘটনার কথা ভেবেই আমি বিলাপ করছি।

রাজলক্ষ্মীর কথা শুনে বীরবরের চোখে মুখে দুঃখের ছায়া পড়ে। বেদনার্ত গলায় বলে বীরবর—দেবি! আপনি যখন রাজলক্ষ্মী তখন আপনার কথা যে মিথ্যে নয় বুঝতে পারছি। কিন্তু, এই ভীষণ অমংগল থেকে উদ্ধার পাবার কি কোনও উপায় নেই?

রাজাকে বাঁচাবার জন্য, রাজ্যের মংগলের জন্য, প্রয়োজনে জীবন বিসর্জন দিতেও আমি রাজী আছি। বলুন দেবী, এই বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় কি?

রাজলক্ষ্মী বললেন—দেখ বৎস, একটিমাত্র উপায় আছে, তবে তা অত্যন্ত কঠিন।

– হোক্ কঠিন, রাজার জন্য কঠিনতম কঠিন কাজ করতেও আমি প্রস্তুত।

—শোন তবে, পূর্বদিকে, আধযোজন দূরে এক দেবী আছেন। সেই দেবীর কাছে গিয়ে, কেউ যদি স্বহস্তে নিজের ছেলেকে বলি দেয়, তবে দেবী সন্তুষ্ট হবেন। তখন রাজার ও রাজ্যের অমংগল কেটে যাবে।

বীরবর বাড়ি এসেই মাঝরাতে জাগিয়ে তুলল স্ত্রীকে। রাজলক্ষ্মীর কাছে শোনা রাজার বিপদের সব কথা জানাল। সবশুনে বীরবরের স্ত্রী ছেলেকে জাগিয়ে তুলল, আর সবকিছু বলল। ছেলেকে এও বলল—দেখ্ বাবা, দেবীর কাছে তোকে উৎসর্গ করে যদি রাজাকে দীর্ঘজীবী করা যায়, সেটা কি ভাল নয়?

ছেলে বলল—মা, এ যখন তোমার আদেশ তখন আমার অমত করার কি আছে? তার ওপর, এতো প্রভুর কাজ। রাজার কাজ করা সবসময়েই তো আমাদের উচিত। তাছাড়া মা, ভেবেই দেখ, জন্মালে যখন মরতেই হবে, তখন রাজসেবায় যদি জীবন দিতে হয়, সে তো মহৎ কাজ, অতীত সৌভাগ্য আমার। বাবা, চলুন, শুভকাজে সময় নষ্ট না করাই উচিত।

বীরবর এবার স্ত্রীকে বলল—দেবীর কাছে নিজেকে বলিদান দিতে

পুত্রের আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি মা। তুমি খুশীমনে যদি ছেলেকে যেতে দাও তবেই এই শুভকাজ সফল হবে।

স্ত্রী বলল—স্বামীর ইচ্ছা বা আদেশ পালন করাই স্ত্রীর কাজ। তাই যাতে তুমি সুখী হবে, আমি তাতেই মত দিচ্ছি। রাজার মংগলে যখন তোমার সুখ তখত তাতে আমারও আনন্দ হবে। তাই খুশীমনেই পুত্রকে ছেড়ে দিচ্ছি। চল, দেবীর কাছে গিয়ে পুত্রের বলিদান শেষ করি।

ছেলে বলল—বাবা, প্রভুর কাজ যারা করে তারাই তো স্বর্গে যায়। তাহলে, চলুন অযথা সময় নষ্ট করছি কেন আমরা?

এরপর বীরবর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দেবীর মন্দিরের দিকে রওনা হল। রাজা রূপসেন বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন বীরবর আর তার পরিবারের লোকজনদের প্রভুভক্তি দেখে। বিস্মিত রাজাও কিন্তু ততক্ষণে বীরবরকে গোপনে অনুসরণ করে এসেছেন দেবী মন্দিরের সামনে।

বীরবর দেবী মন্দিরে পেঁছিয়ে ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-গন্ধ-পুষ্প, নানান্ উপাচারে দেবীকে পুজো করল। তারপর সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করে বলল, জগৎজননী মা! তুমি তুষ্ট হও। তুমি সদয় হও। তোমাকে প্রসন্ন করার জন্য আমি আমার একমাত্র প্রিয়পুত্রকেও স্বহস্তে বলিদান করছি। শুধু কৃপা করে আমার প্রভু, রাজা রূপসেনকে দীর্ঘজীবী কর।

এই কথার শেষে, বীরবর নিজ হাতে পুত্রের মাথাটা খড়্গ দিয়ে কেটে ফেলল। ভাই এর এই রকম হঠাৎ মৃত্যু দেখে, দুঃখে সেই খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলল বীরবরের একমাত্র মেয়ে। ছেলেমেয়ের এই আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় বীরবরেয় স্ত্রীও শোকে-

দুঃখে প্রাণ ত্যাগ করল। এইবার বীরবর মনে মনে বলল—তো আমি যত দূর সম্ভব প্রভুর জন্য যা কর্তব্য করলাম। কিন্তু স্ত্রী পুত্র কন্যা এদের হারিয়ে আমার বেঁচে থাকার মানেই হয় না। —এই ভেবে খড়্গ দিয়ে বীরবরও নিজের মাথা কেটে ফেলল।

মুহূর্তকাল মধ্যেই বীরবরের সম্পূর্ণ পরিবারের এই রকম মৃত্যু ঘটায় রাজা রূপসেনের মনে ভীষণ দুঃখ হল, শেষে বৈরাগ্য জন্মাল। রাজা মনে মনে বললেন, যে রাজকন্যার জন্য বীরবরের মত প্রভুভক্ত সেবকদেরও এইভাবে জীবন দিতে হয় সেই রাজ্য আমি আর ভোগ করতে চাই না। আমি কি স্বার্থপর। আমার জীবনের জন্য বীরবরের কিশোর পুত্র যখন বলিদান দিচ্ছে তা দেখেও কেন বাধা দিলাম না? নাঃ, এর একমাত্র প্রতিকার নিজের জীবন বলিদান দেওয়া।

এই ভেবে রাজা খড়্গ নিয়ে নিজের মাথা কেটে ফেলতে উদ্যত হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দেবী আবির্ভূত হয়ে রাজার হাত ধরে রাজাকে নিরস্ত করলেন। বললেন, বৎস, তোমার সাহস, তোমার শুভ বিবেচনা বিচারবুদ্ধি দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি। বল, কি বর চাও?

রাজা বললেন—দেবী! যদি প্রসন্নই হয়ে থাকেন তবে বীরবর আর তার পরিবারের সকলের জীবনদান করুন। চারজনে যেন আবার বেঁচে ওঠে। এই-ই শুধু আমার প্রার্থনা।

'তথাস্তু'—বলেই দেবী পাতাল থেকে অমৃত বারি এনে প্রত্যেকের গায়ে-মুখে ছিটিয়ে দিতেই বীরবর, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, চারজনেই জীবন ফিরে পেল।

বীরবরদের প্রাণ ফিরে পেতে দেখে আনন্দিত হয়ে ওঠেন রাজা।

রাজা বললেন, দেবী ! সকলের জীবনদান করুন ।

দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর স্তব গান করতে লাগলেন। প্রসন্না দেবী রাজা রূপসেনকে আরও বর দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। পরের দিন সকালে, রাজসভায় বসে রাজা রূপসেন গতরাত্রের সমস্ত কথা সভাসদদের বললেন। বীরবর আর তার পরিবারের সকলের প্রভুভক্তির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তারপর সবার সম্মুখে বীরবরকে অর্ধেক রাজত্ব দান করলেন।

বেতালের গল্প শেষ হল। বেতাল এবার প্রশ্ন করল, বল তো মহারাজ, সমস্ত ঘটনা শুনে কার মহত্ত্ব বেশি মনে হল?

বিক্রমাদিত্য বললেন, আমার বিচারে রাজা রূপসেনের।

—কেন? বেতাল প্রশ্ন করল।

—প্রভুর জন্য জীবন দেওয়া সেবকেরই কাজ। সেজন্য বীরবর যে জীবন দিয়েছিল, সেটা ছিল তার কর্তব্য। কিন্তু সেবকের জন্যযে প্রভু রাজ্যকে তুচ্ছ মনে করে। নিজের জীবন দিতেও উদ্যত হয় এই ঘটনা বিরল। তাই রাজার মহত্ত্ব ঔদার্যই বেশি।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল প্রতিজ্ঞামত শ্মশানে ফিরে গিয়ে শিরীষ গাছের ডালে, আগের মতই প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল। রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছন পিছন ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, আগের মতই কাঁধে ফেলে চলতে লাগলেন।

বেতালও তখন শুরু করল চতুর্থ গল্প··· ···················

বেতালের চতুর্থ গল্প

বেতাল বলল—মহারাজ, শোন তবে চতুর্থ গল্প—

ভোগবতী শহরে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, নাম অনঙ্গসেন। রাজা অনঙ্গসেনের চূড়ামণি নামে শুকপাখি ছিল। শুকপাখি ছিল গুণসম্পন্ন, তাই রাজা সবসময়েই চূড়ামণি শুকপাখিকে নিজের কাছে কাছেই রাখতেন।

একদিন রাজা শুকপাখিকে জিজ্ঞেস করলেন চূড়ামণি, তোমার বিশেষ কি গুণ আছে? বিশেষ কি ক্ষমতা আছে?

শুকপাখি উত্তর করল—মহারাজ, আমি ভুত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই তিনকালের কথাই নির্ভুলভাবে বলতে পারি।

রাজা অনঙ্গসেন শুকপাখির কথা শুনে হাসলেন। বললেন, তাহলে তো তুমি ত্রিকালজ্ঞ? তাই যদি হয়, তবে বলতো চূড়ামণি, আমার উপযুক্ত কন্যা কোথায় আছে যাকে আমি বিয়ে করতে পারি?

শুকপাখি চূড়ামণি বলল, মহারাজ! মগধরাজ বীরসেনের এক পরম রূপবতী-গুণবতী কন্যা আছে। নাম চন্দ্রাবতী। তাঁর সংগেই আপনার বিয়ে হবে।

রাজা শুকপাখির কথা সঠিক কিনা পরীক্ষা করার জন্য রাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ গণক চন্দ্রকান্তকে ডেকে নিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—পণ্ডিত, বলুনতো, আমার বিবাহযোগ্যা কন্যা কোথায় আছে?

চন্দ্রকান্ত জ্যোতিষী তাঁর গণনায় বিচার করে বললেন—মহারাজ, মগধদেশের রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গেই আপনার বিয়ে হবে।

—রাজা তাঁর প্রিয় শুকপাখি চূড়ামণির কথা সঠিক হওয়ায় বড় খুশী হলেন।

তারপর রাজা অনঙ্গসেন একজন দক্ষ, বুদ্ধিমান, সুবক্তা ব্রাহ্মণকে এনে সবকিছু বুঝিয়ে, মগধরাজ্যে পাঠালেন নিজের বিয়ের প্রস্তাব করে।

এদিকে মগধ-রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর ছিল এক শারিকা। ত্রিকালজ্ঞ বলে তারও খুব খ্যাতি ছিল। এই শারিকার নাম ছিল মদনমঞ্জরী।

চন্দ্রাবতী একদিন শারিকা মদনমঞ্জরীকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে তুই তো ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই দেখতে পাস? বলতো, কার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে?

শারিকা মদনমঞ্জরী বলল, রাজকন্যে, তোমার বিয়ে হবে ভোগবতীর রাজা অনঙ্গসেনের সংগে। এইভাবে অনঙ্গসেন আর চন্দ্রাবতী শুক-শারির মাধ্যমে নিজেদের বিয়ের খবরটা আগেই জেনে গেল।

কিছুদিনের মধ্যে ভোগবতীরাজ অনঙ্গসেনের প্রেরিত ব্রাহ্মণ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এল মগধ রাজার কাছে। মগধরাজ রাজকন্যার ইচ্ছেটা কি জানতে চাইলেন। রাজকন্যা চন্দ্রাবতী এককথায় মত দিয়ে দিল। অনঙ্গসেনের ব্রাহ্মণ দূত বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করে ভোগবতীতে ফিরে গেল। তারপর নির্দিষ্ট দিনে, ভোগবতী-রাজ অনঙ্গসেন আর মগধ রাজকন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। অনঙ্গসেন আর চন্দ্রাবতী সুখে দিন কাটাতে লাগালেন।

বিয়ের পর ভোগবতীতে আসার সময় চন্দ্রাবতী কিন্তু তার প্রিয় শারিকা মদনমঞ্জরীকে নিয়ে আসেন। একদিন রাজা-রাণী, অনঙ্গসেন, মদনমঞ্জরী গল্প করছেন। সামনেই দুটো আলাদা খাঁচায় রয়েছে শুক আর শারি, চূড়ামণি আর মদনমঞ্জরী।

তাই দেখে রাজা বললেন—রাণী চন্দ্রাবতী, দেখ, এদের জন্যই আমাদের বিয়ে হল। অথচ তাকিয়ে দেখ এরা দুজনকে আলাদা থেকে মনমরা হয়ে আছ। আমরা বরং এদের বিয়ে দিয়ে, দুজনকেই একই খাঁচায় রেখে দিই। তাহলে এরা দুজনে আমাদের মতই আনন্দে থাকবে।

রাজার কথায় রাণী একটু হেসে সম্মতি দিলেন। শুকপাখী চূড়ামণির সঙ্গে শারিকা মদনমঞ্জরীর বিয়ে হয়ে গেল। তারপর শুক-শারি একই খাঁচায় রয়ে গেল।

রাজা-রাণী এরপর বেশ আনন্দেই দিন কাটাতে থাকেন। একদিন রাজা অনঙ্গসেন আর রাণী চন্দ্রাবতী রাজ অন্তঃপুরে বসে হাসি-গল্প করছেন। এমনি সময়ে খাঁচার মধ্যে শুক-শারির ঝগড়া শুরু হয়ে গেল।

শুক বলতে লাগল—শারি, তুমি আমার সংগে কথা বলনা, স্ফূর্তি কর না। আমি কাছে গেলেই খাঁচার একপাশে সরে যাও।
—কেন? আমাকে এত অবহেলা কিসের জন্য?
শারিকা বলে—পুরুষ জাতি অত্যন্ত ধূর্ত, শঠ, স্বার্থপর, অধর্মী। এমনকি স্ত্রীকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না, তাই তাদের পছন্দ করি না।
শারিকার কথায় শুকও রেগে ওঠে। বলে, থাম, থাম, স্ত্রীজাতির কথা আর বোল না। স্ত্রীজাতির মত কুটিলা, চপলা, মিথ্যুক আমি আর দ্বিতীয় কাউকে দেখি নি। এমনকি তারা পুরুষ-ঘাতিনীও হয়ে ওঠে।
শুক-শারির এই ঝগড়া শুনে রাজা অনঙ্গসেন তাদের ঝগড়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, আঃ, শুক-শারি, তোমরা শুধু-শুধু এরকম ঝগড়া করছ কেন? মিথ্যে একে অন্যকে দোষারোপই করছ কেন?
শারিকা মদনমঞ্জরী গলা ফুলিয়ে বলে ওঠে, মহারাজ, পুরুষ জাতি অধর্মপরায়ণ। সেইজন্যই পুরুষদের ওপর আমার বিশ্বাস নেই। তাদের ওপর আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নেই। শুনুন তবে, পুরুষদের ব্যবহার আর চরিত্র কেমন। শারিকা বলতে শুরু করে—

ইলাপুরে মহাধন নামে এক ধনশালী বণিক বাস করত। বহুদিন কেটে যাবার পরও বণিক মহাধনির কোনও ছেলে না হওয়ায় মনে তার বড় দুঃখ ছিল। কিন্তু শেষকালে ভগবানের দয়ায় মহাধনের এক পুত্রসন্তান জন্মাল। বণিক, পুত্রের নাম রাখলেন নয়নানন্দ।

নয়নানন্দ যখন পাঁচ বছরের হল, তখন লেখাপড়া শেখার জন্য বণিক ভাল শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু নয়নানন্দ পড়াশুনায় মন না দিয়ে ক্রমেই কুসংগে মিশতে লাগল। নয়নানন্দের যত বয়স বাড়তে লাগল ততই সে উচ্ছৃংখল হয়ে উঠল। শেষে, মন্দ ধরনের ছেলে হয়ে গেল।

এমনি করে কিছুদিন যায়। শেষে একদিন ধনী বণিক মহাধন মারা গেল। পুত্র নয়নানন্দ তখন বড় হয়েছে। মহাধনের বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হয়েছে সে। এত অর্থ হাতে আসায় ভোগ-বিলাস, মদ্যপান, তাসা-পাশায় আর কুসংসর্গে অল্পদিনের মধ্যেই নয়নানন্দ পিতার বিপুল সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলল। ক্রমে অর্থের অভাব দেখা দিল। কষ্ট শুরু হল নয়নানন্দের।

এরপর নয়নানন্দ অর্থের আশায় ইলাপুর ছেড়ে নানান দেশে ঘুরে, সবশেষে উপস্থিত হল চন্দ্রপুর বণিক হেমগুপ্তের বাড়িতে। নয়নানন্দ জানত পিতার সংগে বণিক হেমগুপ্তর বন্ধুত্ব ছিল।

নয়নানন্দের পরিচয় পেয়ে হেমগুপ্ত অত্যন্ত খুশী হলেন। তারপর সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, বাবাজী হঠাৎ এখানে এসে উপস্থিত কি করে?

নয়নানন্দ মিথ্যে করে বলল, কিছু বাণিজ্যপোত নিয়ে ব্যবসা করার জন্য যাচ্ছিলাম সিংহলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। পথে প্রবল ঝঞ্ঝা-তুফানে বাণিজ্য-তরী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ডুবে গেল। আমার সংগী-সাথীরা কে-কোথায় ভেসে গেল সে হুঁসও আমার ছিল না। ব্যবসায়ের জিনিসপত্র সবই জলমগ্ন হয়ে গেছে। সৌভাগ্যবশত একখণ্ড কাঠ ধরে বহুকষ্টে প্রাণরক্ষা করেছি। তীরে এসে বুঝলাম আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। এই অবস্থায়,

কোথায় যাই, কার কাছে যাই ভাবতে ভাবতে আপনার কথা মনে এল, তাই হঠাৎ এখানে এসেছি।

নয়নানন্দের কথা শুনে দুঃখ পেলেন হেমগুপ্ত। কিন্তু সংগে সংগে একটা কথা তার মনে এল। ভাবলেন, বহুদিন ধরেতো পাত্র খুঁজছিলাম রত্নাবতীর জন্য। মনের মত বর পাচ্ছিলাম না। তাই বোধ হয় ভগবান কৃপা করে বন্ধুপুত্র নয়নানন্দকে এখানে এনে দিয়েছেন। বন্ধু মহাধন ধনাঢ্য বণিক ছিলেন। একমাত্র পুত্রের জন্য নিশ্চয়ই অনেক ধন-সম্পত্তি রেখে গেছেন। ভাল বংশের ছেলে, সদ্‌গুণও নিশ্চয় আছে। এইই রত্নাবলীর উপযুক্ত পাত্র। যত তাড়াতাড়ি পারি এর সংগে রত্নাবলীর বিয়ে দেব। সুপাত্র হাতছাড়া করা ঠিক নয়।

এইসব ভেবে হেমগুপ্ত স্ত্রীর কাছে গিয়ে সবকিছু বললেন। সব-শুনে স্ত্রী বললেন, এই সবই ভগবানের ইচ্ছে। না হলে হঠাৎ এমন সুপাত্র এখানে আসে। যাও যত তাড়াতাড়ি পার দুজনের এই বিয়ে মিটিয়ে ফেল।

স্ত্রীর সম্মতি পেয়ে শ্রেষ্ঠী হেমগুপ্ত নয়নানন্দের কাছে গিয়ে মেয়ের সংগে বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। অর্থহীন নয়নানন্দ এ সুযোগ মুহূর্তে গ্রহণ করে বিয়েতে সম্মতি জানাল।

তারপর শুভদিন দেখে, নয়নানন্দ আর রত্নাবতীর বিয়ে হয়ে গেল। বর ও কন্যা সুখে দিন কাটাতে লাগল।

বেশ কিছুদিন সুখে কেটে গেল। কিন্তু তারপরই নয়নানন্দের অসৎ অভিসন্ধির উদয় হল। নয়নানন্দ স্ত্রীকে গিয়ে বলল, বহুদিন দেশে যাই নি। বন্ধুবান্ধবদের কোনও খবরাখবর পাই

নি, তাই এবার দেশে ফিরতে চাই। তোমার বাবা-মায়ের মত পেলেই দেশে ফিরতে পারি। রত্নাবতী, যাও, তোমার বাবা-মায়ের মতটা নিয়ে এস। হ্যাঁ, যদি চাও, তুমিও আমার সংগে আমার দেশে যেতে পার।

রত্নাবতী বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে স্বামীর মনের অবস্থা জানাল। স্বামীর ইচ্ছার সম্মতি জানাতে অনুরোধ করল। হেমগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী খুশী মনেই কন্যা-জামাতাকে যাবার আদেশ দিলেন।

রত্নাবতী এসে জানাল সব। আর তারই সংগে এও বলল—তোমার সংগে আমিও যাব শ্বশুরালয়ে। একলা তোমাকে ছেড়ে দেব না।

শুভ দিন দেখে হেমগুপ্ত বহু জিনিসপত্র ও ধন-রত্ন দিয়ে নানান অলংকারে মেয়েকে সাজিয়ে জামাতা নয়নানন্দের সংগে রওনা করে দিলেন শ্বশুরালয় ইলাপুরের দিকে। সংগে গেল লোকলস্কর। শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করে মহানন্দে স্বদেশের পথে রওনা হল সস্ত্রীক নয়নানন্দ। পাল্কীতে চড়ে লোকলস্কর নিয়ে রওনা হল দুজনে।

চলতে চলতে পাল্কী উপস্থিত হল এক গভীর জংগলের মধ্যে। নয়নানন্দ তখন রত্নাবতীকে বলল, দেখ, এই বনে ভয়ংকর সব ডাকাত আছে। গহনা পরে লোকলস্কর নিয়ে হৈ চৈ করে এই-ভাবে এখানে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পাল্কী করে গেলেই ডাকাতদের নজরে পড়ে যাব। তার চেয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে যাই। আর তোমার গায়ের অলংকারগুলো খুলে দাও, পুঁটলি বেঁধে আমার কাছে লুকিয়ে রাখি। বাহকরা লোকলস্করেরা পাল্কী

নিয়ে তোমাদের বাড়িতে ফিরে যাক।' তাহলেই আমরা নিরাপদে এই গভীর জংগলটা পেরিয়ে যেতে পারব।

নয়নানন্দের কথামত রত্নাবতী সমস্ত অলংকার খুলে স্বামীর হাতে দিল। দাস-দাসী, পাল্কী বাহকরা সব ফিরে চলে গেল। রত্নাবতী নয়নানন্দের সংগে সংগে জংগলের মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করল। নয়নানন্দ রত্নাবতীকে ক্রমেই গভীরতর জংগলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, শেষে এক কূপের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। রত্নাবতীর অলংকার ধনরত্ন নিয়ে নয়নানন্দ পালিয়ে এল নিজের দেশে।

রত্নাবতী কূপের মধ্যে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদলে লাগল। সৌভাগ্য-ক্রমে সেই সময় এক পথিক কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। রত্নাবতীর কান্না শুনে, কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে, কূপের কাছে পথিক এল। তারপর কূপের ভিতরে তাকিয়ে চমকে উঠল। আরে! কূপের মধ্যে যে সুন্দরী মেয়ে।

পথিক বহুকষ্টে রত্নাবতীকে ওপরে ওঠায়, তারপর জিজ্ঞেস করে, তুমি কে গো মেয়ে? এই ভয়ংকর জংগলে একাকী এলে কি করে? কি করে এই গভীর কূপের মধ্যে পড়ে গেলে?

স্বামীর নিন্দা উচিত নয়, এইভেবে রত্নাবতী সত্য ঘটনা গোপন রেখে বলল, আমি রত্নাবতী, চন্দ্রপুরের শ্রেষ্ঠী হেমগুপ্তের মেয়ে। আমি স্বামীর সংগে ইলাপুরে যাচ্ছিলাম। পথে, দস্যুরা এই জংগলে আমাদের আক্রমণ করে আমার সমস্ত অলংকার কেড়ে নেয়। তারপর স্বামীকে নির্দয়ভাবে মারতে মারতে ধরে নিয়ে যায়। যাবার সময় কূপের মধ্যে আমাকে ফেলে দিয়ে চলে যায়।

রত্নাবতীর এই কল্পিত কাহিনী পথিক বিশ্বাস করে। রত্নাবতীর

দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। শেষে রত্নাবতীকে নিয়ে গিয়ে পেঁছিয়ে দেয়, পিত্রালয়ে শ্রেষ্ঠী হেমগুপ্তের কাছে।
রত্নাবতীকে এরকমভাবে একাকী ফিরে আসতে দেখে হেমগুপ্ত বিস্মিত হন। তারপর মেয়ে রত্নাবতীর কাছ থেকে কল্পিত কাহিনী শোনবার পর, তারা মেয়ে-জামাই-এর দুর্দশার কথা ভেবে বিচলিত হন।

শ্রেষ্ঠী হেমগুপ্ত বলেন, ভাবিস নাঃ রত্না, নয়নানন্দকে দস্যুরা মারে নি। অর্থের জন্যই তারা তোদের আক্রমণ করেছে। আমার বিশ্বাস, নয়নানন্দের কাছ থেকে টাকা-পয়সা হীরে-মোতী সব-কিছু কেড়ে নিয়ে তাকে ছেড়েই দেবে। অকারণে তাকে হত্যা করবে না। মেয়েকে আশ্বাসবাণী শোনান হেমগুপ্ত। তারপর নূতন করে আবার অলংকার বানিয়ে দেন কন্যা রত্নাবতীকে।
ওদিকে নয়নানন্দ রত্নাবতীর সোনা-দানা অলংকার সব বিক্রী করে টাকা পয়সা নিয়ে বন্ধুবান্ধবের সংগে আবার উচ্ছৃংখল জীবন শুরু করল। দিনরাত পানভোজন পাশা, বিলাসিতায় দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু ক্রমে এই সব টাকা পয়সা ও শেষ হয়ে গেল। অর্থের অভাব দেখা দিল। তখন নয়ানন্দের মনে পড়ল স্ত্রী রত্নাবতীর কথা।

অনেক চিন্তা-ভাবনা করে নয়নানন্দ স্থির করল আমি তো জংগলে কূপের মধ্যে ফেলে এসেছি রত্নাবতীকে। নিশ্চয়ই এতদিনে অনাহারে বেচারী মারাই গেছে। তাই আবার যদি হেমগুপ্তের কাছে যাই, দু-চারদিন থাকার সুযোগ পাই, তবে নিশ্চয় আবার কিছু অর্থের সংস্থান করে আসতে পারত।
এই ভেবে, নয়নান্দ একদিন আবার হাজির হল শ্বশুরালয়ে।

কিন্তু সেখানে পেঁাছিয়ে প্রথমেই রত্নাবতীর সংগে তার দেখা হল। রত্নাবতীকে দেখে তো চমকে ওঠে নয়নানন্দ।
স্বামীর অবস্থা দেখে রত্নাবতী ভাবে এই মুহূর্তে স্বামীকে যদি আমি এখানে কি কল্পিত কাহিনী বলেছি বলে না দিই, তাহলে বেচারা হয়ত সত্যি কথা বলে বিপদেই পড়বে, নয়ত এক্ষুনি এখান থেকে পালাবে।
রত্নাবতী তখন নয়নানন্দকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে সব কিছু বলে। কি কল্পিত কাহিনী বলেছে সবিস্তারে জানায়। সবশেষে বলে, আমার বাবা মা তোমার জন্য বিশেষ চিন্তায় আছেন। ওদের সংগে দেখা হলে তুমি আমার কাহিনীই আবার বলবে। এই বলে রত্নাবতী বাড়ির ভিতরে চলে যায়।
ধূর্ত নয়নানন্দ তখন ধীরে ধীরে বাড়িতে ঢুকে হেমগুপ্তকে প্রণাম করল। রত্নাবতীর শেখানো কাহিনী পুনরাবৃত্তি করে। হেমগুপ্ত সবশুনে নয়নানন্দের দুর্ভাগ্যের জন্য বারবার সহানুভূতি জানালেন।
নয়নানন্দ আগের রত্তই শ্বশুরালয়ে রয়ে গেল। বরং আদর-যত্ন বেশিমাত্রাতেই পেল সেদিন।
তারপর রাত্রিবেলায় নয়নানন্দ যখন শুতে গেল, তখন দেখে, রত্নাবতী তার নতুন পাওয়া সব অলংকার পরে সেজে এসেছে। বহুদিন পরে স্বামীকে দেখে রত্নাবতী সেদিন বড় খুশী, তাই তার এত সাজসজ্জা।
রত্নাবতীর নতুন অলংকার দেখে ধূর্ত নয়নানন্দের মনে আবার লোভ দেখা দিল। তাই সামান্য কিছু কথাবার্তার পরই ধূর্ত নয়নানন্দ কপট ঘুমের ভান করে শুয়ে পড়ল। তারপর শুরু

করল কপট নাসিকা গর্জন। স্বামীকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে সিধেসাধা সরল মেয়ে রত্নাবতীও স্বামীর পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর যখন রাত গভীর হল, ধূর্ত নয়নানন্দ কপট নিদ্রা ছেড়ে উঠে বসল। কোমরে লুকানো ছুরি বার করে সুন্দরী স্ত্রী রত্নাবতীর কণ্ঠনালী কেটে ফেলল। তারপর সমস্ত অলংকার নিয়ে পালিয়ে গেল।

গল্পশেষে শারিকা বলে—মহারাজ! এই হচ্ছে পুরুষজাতির চরিত্র। এই সব আমার নিজের চোখে দেখা। আর সেজন্য পুরুষজাতিকে আমি ঘৃণা করি,' তাদের অবিশ্বাসও করি। তারপরে থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, পুরুষজাতির মুখ দর্শন করব না। শুকের সংগে এইজন্যই থাকতে আমি অনিচ্ছুক।

শারিকার গল্প শুনে রাজা শুককে হেসে বললেন—হ্যাঁ হে চূড়ামণি, শারিকা মদনমঞ্জরীর রাগের কারণ না হয় বুঝলাম। তোমার কেন এত রাগ স্ত্রী জাতির ওপর, সেটাওতো শোনা দরকার।

শুক বলল, নিশ্চয়ই মহারাজ। শুনুন তবে।

সাগরদত্ত নামে এক অর্থবান শ্রেষ্ঠী বাস করতেন কাঞ্চনপুরে। শ্রীদত্ত নামে সেই শ্রেষ্ঠীর এক ধীর—স্থির সর্বগুণ যুক্ত ছেলে ছিল। কালে, শ্রীদত্তের সংগে অনঙ্গপুরের শ্রেষ্ঠী, সোমদত্তের কন্যা জয়শ্রীর বিয়ে হল।

বিয়ের কিছুদিন পরে শ্রীদত্ত বাণিজ্যের জন্য বিদেশে রওনা হল। জয়শ্রী তখন তার পিত্রালয়ে আনন্দপুরে ফিরে গিয়ে, বাবা-মায়ের সংগে থাকতে লাগল। এদিকে দীর্ঘদিন পার হয়ে গেল, শ্রীদত্ত তবুও বাণিজ্য থেকে ফিরে এল না।

শ্রীদত্তের জন্য সবাই চিন্তিত হল, শুধু তার স্ত্রী জয়শ্রী ছাড়া। জয়শ্রী বন্ধু-বান্ধব নিয়ে অসংযত—চঞ্চলা জীবন যাপন করতে লাগল। স্বামীর জন্য তার বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা ছিল না। ঠিক এমনি সময়ে, দীর্ঘদিন পরে, শ্রীদত্ত বাণিজ্য শেষে ফিরে এল কাঞ্চনপুরে। স্ত্রী সেখানে নেই দেখে অনঙ্গপুরে এল স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে, যাবার জন্য।

দীর্ঘদিন পরে বাড়িতে জামাই এসেছে, তাই সেদিন সোমদত্ত নানান উৎসব আনন্দের ব্যবস্থা করলেন। শ্রীদত্ত সমস্ত দিনক্ষণ আনন্দ উৎসব উপভোগ করল। কিন্তু জয়শ্রীর মনে শান্তি নেই। শ্রীদত্ত ফিরে আসাতে, তার বেহিসেবী চলাফেরা এমনকি রাত্রি-বেলায় বাড়ির বাইরে যাওয়াও বন্ধ হবে, এইসব ভেবে জয়শ্রীর মনমেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

রাত্রিবেলা জয়শ্রীর মা যখন তাকে নানান অলংকারে সাজিয়ে শ্রীদত্তের কাছে শয়নকক্ষে পাঠাতে চাইলো জয়শ্রী যেতে রাজী হোল না। শেষকালে জোর করেই জয়শ্রীকে তার মা শ্রীদত্তের কাছে পাঠাল।

জয়শ্রীর এখন স্বামীকে একটুও ভাল লাগে না। অসংযত জীবন-যাপন করে মন তার সদাই নানান সুখের জন্য এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তাই স্বামীর কাছে এসেও জয়শ্রী একটা কথাও বলল না শ্রীদত্তের সংগে। স্বামীর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে থাকল। বেচারী শ্রীদত্ত আর কি করে? সে ভাবল দীর্ঘদিন না আসায় স্ত্রীর বুঝি অভিমান হয়েছে। শ্রীদত্ত তাই জয়শ্রীর অভিমান ভাঙ্গাবার জন্য প্রথমে অনেক মিষ্টি কথা বলল। কিন্তু তাতেও জয়শ্রী আগের মতই পিছন ফিরেই থাকল। তখন শ্রীদত্ত যেসব

দামীদামী অলংকার, কাপড়-চোপড় এনেছিল সেগুলো স্ত্রীকে দিল। কিন্তু জয়শ্রী রাগে সেসবই মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সাদাসিধে মানুষ শ্রীদত্ত তখন মনমরা হয়ে শুয়ে পড়ল, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল।

শ্রীদত্তকে অঘোরে ঘুমাতে দেখে দুষ্টা ধূর্তা জয়শ্রী বিছানা থেকে

জয়শ্রী রাগে সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ওঠে। মাটিতে ছুঁড়ে ফেলা সব অলংকার একে একে পড়ল। শ্রীদত্তের আনা মহামূল্য শাড়ী গায়ে জড়াল। তারপর গোপন দরজা দিয়ে বন্ধুর বাড়ির দিকে রওনা হল।

মহামূল্য অলংকার আর সাজসজ্জায় সেজে জয়শ্রী যখন অন্ধকার পথ দিয়ে চলেছে তখন একটি চোর তা দেখতে পেল। চোর ভাবল, এই আঁধার রাতে আমাদের মত তস্কররাই এমন নিঃশব্দে একাকী চলাফেরা করে। কিন্তু এই সুন্দরী মেয়ে এত গহনাগাঁটি পড়ে নিঃশব্দে যায় কোথায়? ব্যাপার কি? এই ভেবে, চোর জয়শ্রীকে গোপনে অনুসরণ করতে লাগল।

জয়শ্রী দ্রুত এসে পেঁছাল তার বন্ধু বাড়িতে। বন্ধুকে বলল, কি, দেরী করে এলাম বলে রাগ করেছ? কি করব বল, হঠাৎ আজ বাণিজ্য থেকে ফিরে এসেছে স্বামী, তাই সে ঘুমাবার পর তবেই তো আসতে হল। জয়শ্রীর এই কথাতেও তার বন্ধু কোন উত্তর না করে শুয়েই থাকল।

এদিকে হয়েছে কি কালনাগিনী সাপ এসে জয়শ্রীর এই বন্ধুকে আগে-ভাগেই কামড়ে মেরে ফেলেছে। তাই জয়শ্রীর বন্ধু বিছানায় মরেই পড়ে ছিল। জয়শ্রী তো তা বুঝতে পারেনি। তাই জয়শ্রী বারবার তাকে কথা বলার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। চোর গোপন জায়গা থেকে এসব দেখছিল আর বেশ মজা পাচ্ছিল। চোর ভাবছিল, মেয়েটা কি? এত রাতে কার কাছে এসে এমন করছে?

ওদিকে বাড়ির কাছেই এক বিরাট বটগাছ ছিল। বটগাছে থাকত এক পিশাচ। পিশাচও এই ঘটনাটা দেখছিল। জয়শ্রীর এইসব ব্যাপার দেখে তার ভীষণ রাগ হল। সে মনে মনে বলল, এই

খারাপ মেয়েটাকে শাস্তি দেওয়া উচিত। বড়িতে বর রয়েছে, তা সত্ত্বেও এখানে এল, অন্যের সংগে স্ফূর্তি করতে?

এই ভেবে, পিশাচ, ঐ মৃত লোকটার দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর যেই জয়শ্রী আবার তার ঐ মৃত বন্ধুর কাছে এসে তাকে কথা বলার জন্য অনুরোধ করছে তক্ষুনি দাঁত দিয়ে জয়শ্রীর নাকটা কামড়ে ছিঁড়ে নিল। জয়শ্রীর আধখানা নাক ঐ মৃত লোকটার মুখের মধ্যে রয়ে গেল।

জয়শ্রীর এতক্ষণে জ্ঞান হল। ভাল করে দেখতেই বুঝতে পারল তার বন্ধু বহু আগেই মারা গেছে। জয়শ্রী এই ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। ভাবতে লাগল, এখন কি করি?

সেই সময়ে ঐ বাড়িতে জয়শ্রীর এক প্রিয় সখী এসে হাজির হয়। এই প্রিয়সখী, জয়শ্রী আর তার এই বন্ধুর কথা জানতে। জয়শ্রী প্রিয়সখীকে বলল, ভাই বড় বিপদে পড়েছি। কাটা নাক নিয়ে বাড়ি যাই কি করে? বাবা-মা জিজ্ঞেস করলেই বা বলব কি? দেখ দেখি, স্বামীও ফিরে এসেছে এতদিন পর। সেই বা এই চেহারা দেখে বলবে কি? নাঃ, বিষ খেয়ে মরা ছাড়া আর পথ নেই দেখছি। এই বলে জয়শ্রী কাঁদতে লাগল।

কাঁদতে কাঁদতেই হঠাৎ এক দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় এল জয়শ্রীর। কান্না থামিয়ে প্রিয়সখীকে বলে, দেখ, আমি এখনই এই অবস্থায় বাড়িতে ফিরে গিয়ে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ব। তারপর, হঠাৎ চিৎকার করে কাঁদতে থাকব। আমার কান্নার শব্দে বাড়ির সবাই জেগে উঠে ঘরে আসবে। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করবে। তখন বলব, আমার স্বামী অকারণে হঠাৎ রেগে উঠে আমাকে মারধোর করতে করতে শেষে রাগে আমার নাক কেটে দিয়েছে।

জয়শ্রীর প্রিয়সখী কথাটা শুনে বলল, বাঃ সুন্দর বুদ্ধি, বার করেছিস। এতে তোর বরও ঠাণ্ডা হবে শ্বশুর বাড়ি থেকে পালাতে পথ পাবে না। তুইও নিশ্চিন্তে বাপের বাড়িতে থেকে গিয়ে আগের মতই স্ফূর্তি করতে পারবি।

মতলব মত, জয়শ্রী দ্রুত বাড়িতে ফিরে এসে, গোপন পথে তার শোবার ঘরে ঢুকে শ্রীদত্তের পাশে শুয়ে পড়ল। তারপর কিছুক্ষণ পর যথারীতি চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। চিৎকার উত্তেজনার কাটা নাক দিয়ে আবার রক্ত পড়তে লাগল। বিছানা, জামা-কাপড় সব রক্তে ভেসে গেল।

মাঝরাতে জয়শ্রীর চিৎকারে সব্বাই তাদের শয়নকক্ষে এসে ঢোকে। রক্তাক্ত মুখে জয়শ্রীকে পড়ে থাকতে দেখে সোমদত্ত জিজ্ঞেস করে, —একি! এভাবে তোর নাক কাটল কে।

জয়শ্রী কথার উত্তর না দিয়ে, আঙ্গুল তুলে শ্রীদত্তকে দেখিয়ে দেয়। বেচারা শ্রীদত্ত এসব ব্যপার তো কিছুই জানত না। জয়শ্রীর চিৎকারে তারও ঘুম ভেঙ্গেছে। ঘুমভাঙ্গা চোখে সে শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

শ্রীদত্তকে চুপ করে থাকতে দেখে সোমদত্ত ভাবে তার মেয়ের কথাই সত্যি। সোমদত্ত আর বাড়ির সবাই শ্রীদত্তকে যা নয় তাই বলে গালিগাল দিতে থাকে। গোবেচারা ভালমানুষ শ্রীদত্ত ভাবে, হঠাৎ শ্বশুরবাড়িতে চলে এসেব এই ঝামেলায় পড়েছি। মনে হচ্ছে, সবকিছুই জয়শ্রীর ছলচাতুরী। বুঝতে পারছি জয়শ্রী দুষ্টা স্ত্রী। জানি না এখন ঘটনাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

পরের দিন সকালে সোমদত্ত রাজদরবারে শ্রীদত্তের বিরুদ্ধে নালিশ

জানল। শ্রীদত্তকে রাজসভার বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হল। জয়শ্রীকেও রাজসভায় নিয়ে আশা হল।
বিচারপতি প্রথমে জয়শ্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাক কে এমন নির্দয় ভাবে কেটে নিয়েছে? সঠিক উত্তর দাও আমি সেই বর্বর মানুষকে কঠিন শাস্তি দিতে চাই।
জয়শ্রী স্বামী শ্রীদত্তের দিকে তাকিয়ে বলল, ধর্মাবতার উনি আমার স্বামী। উনিই আমার এই দুর্দশা করেছে।
এবার বিচারপতি শ্রীদত্তকে জিজ্ঞেস করলেন, এই জঘন্য হিংস্র কাজ করলে কেন?
শ্রীদত্ত শুধু উত্তর করল ধর্মাবতার এই ঘটনার, কোন কিছুই আমি জানি না। আপনার বিচারে যা স্থির করবেন আমি তাই মাথা পেতে নেব।
বিচারক ভাবলেন, শ্রীদত্তের বলার আর কিছু নেই। তাই তিনি আদেশ দিলেন, যাও, শ্রীদত্তকে এই মুহূর্তেই শূলে চড়াও।
এদিকে এই সবকিছু ব্যাপারই চোর দূর থেকে দেখছিল। নিরপরাধ শ্রীদত্তের শাস্তি হচ্ছে দেখে চোরেরও মনে কষ্ট হল। সে বিচারকের সামনে এসে বলল, ধর্মাবতার! একি করছেন! আপনি একজন নির্দোষীকে শূলে দিচ্ছেন? এই বলে চোর যা দেখেছিল এক এক করে সব বলল। এও বলল, এই মেয়েটিই দুষ্টা, অসৎ।
চোরের কথা শুনে বিচারক ব্যাপারটা ভাল করে অনুসন্ধান করতে বললেন রাজরক্ষীদের। রাজরক্ষীরা চোরের সংগে জয়শ্রীর সেই বন্ধুর বাড়িতে গেল। সেখানে জয়শ্রীর সেই বন্ধু মরে পড়ে আছে, দেখতে পেল রাজরক্ষীরা। মৃত বন্ধুর মুখের মধ্য থেকে জয়শ্রীর কর্তিত নাকের অংশটি ও উদ্ধার করল।

বিচারক সমস্ত ঘটনা দেখে বিস্মিত হলেন। নিরপরাধ শ্রীদত্তকে মুক্তি দেওয়া হল। শ্রীদত্তের ওপর নির্দয় ব্যবহার করা হয়েছে বলে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ দেওয়া হল। সৎসাহসের জন্য চোরকে পুরস্কৃত করা হল। আর সবশেষে, দুষ্ট নারী জয়শ্রীর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ,ঢেলে, গাধার পিঠে চাপিয়ে, সমস্ত শহরে ঘোরান হল।

গল্পশেষে শুকপাখি চূড়ামণি বলল— বুঝলেন, মেয়েদেরই শুধু এমন জঘন্য গুণাবলী থাকে।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল এবার প্রশ্ন করল—বল তো মহারাজ, নয়নানন্দ আর জয়শ্রীর মধ্যে কাকে বেশি দুষ্ট ও ধূর্ত মনে হয়?

বিক্রমাদিত্য বললেন—দুজনেই সমান।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল মুহূর্তেই শ্মশানে ফিরে, শিরীষ গাছের ডালে আগের মতই প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছন পিছন ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, আগের মতই কাঁধে ফেলে চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল পঞ্চম গল্প......

বেতালের পঞ্চম গল্প

বেতাল বলল, মহারাজ, শোন তবে পঞ্চম গল্প—

মহাবল নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বাস করতেন ধারানগরে। হরিদাস নামে তাঁর একজন দূত ছিল। হরিদাসের এক সুন্দরী-গুণবতী মেয়ে ছিল, নাম মহাদেবী। মহাদেবীর বয়স বাড়ার সংগে সংগে তার বিয়ের কথা সবসময়েই বাড়িতে আলোচিত হত।

বিয়ের কথাবার্তা হতে মহাদেবী বাবাকে বলল—দেখ বাবা, তুমি গুণবান লোক ছাড়া কারুর সঙ্গে আমার বিয়ে দিও না। গুণহীন অর্থবানের চেয়ে, অর্থহীন গুণবান পাত্র অনেক ভাল। মেয়ের কথায় খুশী হয়ে হরিদাস মেয়ের ইচ্ছামতই পাত্র খুঁজতে লাগল। এমনি সময়ে একদিন রাজা মহাবল হরিদাসকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—দেখ হরিদাস, আমার বিশেষ বন্ধু হরিশ্চন্দ্র দক্ষিণদেশের

রাজা। বহুদিন হোল আমি বন্ধু হরিশ্চন্দ্রের কোনও খবর পাচ্ছি না। যাও, তুমি গিয়ে তার কুশল সংবাদাদি নিয়ে এসো।

রাজার আদেশ অনুসারে হরিদাস পরের দিনই দাক্ষিণদেশে রওনা হল। কয়েকদিনের মধ্যেই দক্ষিণদেশের রাজধানীতে পেঁৗছিয়ে, রাজা হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে, রাজা মহাবলের চিঠিপত্র দিল। বন্ধু মহাবলের খবর হরিদাসের কাছ থেকে পেয়ে দক্ষিণদেশের রাজা হরিশ্চন্দ্র তো মহাখুশী। দূত হরিদাসকে পুরস্কৃত করলেন। বললেন, হরিদাস, থেকে যাও এরাজ্যে কিছুদিন।— রাজবন্ধুর অনুরোধে হরিদাস দক্ষিণদেশের রাজধানীতে থেকেই গেল কিছুদিন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র যখন সভায় যান, হরিদাসকেও নিয়ে যান। একদিন রাজসভায় বসে হরিশ্চন্দ্র হঠাৎ হরিদাসকে প্রশ্ন করলেন— হরিদাস, বলতে পার, কলিযুগ কি শুরু হয়েছে?

—হ্যাঁ মহারাজ। স্থির কন্ঠে বলে হরিদাস। বলে—কলিযুগে যা হয় এখন তো তাই-ই হচ্ছে। প্রবঞ্চনা, রাজা-প্রজার লড়াই ব্রাহ্মণের ধর্মে বিতৃষ্ণা, নারীজাতির সম্ভ্রম রক্ষায় অবহেলা, পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যার মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, এসবই কলিযুগের লক্ষণ। এসবই আজ চারদিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন। কলিযুগ এসেছে বলেই, ধরিত্রী মাতা কম শস্য-ফুল-ফল দিচ্ছেন। কলিযুগ এসেছে বলেই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

হরিদাসের জ্ঞান দেখে রাজা হরিশ্চন্দ্র আরও খুশী হলেন। হরিদাসের পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

সভাশেষে হরিদাস নিজ বাসস্থলে এসে দেখে এক ব্রাহ্মণপুত্র তার

জন্য অপেক্ষা করছে। হরিদাস ব্রাহ্মণপুত্রকে জিজ্ঞেস করল—কে গো তুমি ? আমার জন্য অপেক্ষা করছ কেন ?

ব্রাহ্মণসন্তান বলল—আপনার পরমাসুন্দরী এক মেয়ে আছে, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।

হরিদাস সব শুনে বলল—তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, স্বেচ্ছায় আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছ, এতো আনন্দের কথা। কিন্তু একটু যে অসুবিধে আছে। মেয়েকে কথা দিয়েছি সর্বগুণসম্পন্ন ছেলের সংগেই তার বিয়ে দেব। তা তোমার বিশেষ কিছু গুণ আছে কিনা তাতো জানি না।

ছেলেটি বলল—আমি ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনা করে নানান বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছি। এ ছাড়াও আমি এক আশ্চর্য রথ তৈরি করেছি যার ফলে এক বছরের পথ একদণ্ডে অতিক্রম করা যায়। আপনি নিজেই তা পরীক্ষা করতে পারেন।

হরিদাস এই সব শুনে সুলক্ষণযুক্ত সুদর্শন ব্রাহ্মপুত্রকে কথা দিল, তার সংগেই মেয়ে মহাদেবীর বিয়ে দেবে। হরিদাস তার পর রাজা হরিশচন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজদেশে ফেরার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল।

পরের দিন সকালে ব্রাহ্মণপুত্র তার বিশেষ ক্ষমতাযুক্ত রথ নিয়ে এল। সেই রথে দুজনে চড়ে মুহূর্ত-মধ্যে ধারানগরে এসে পেঁছাল। ব্রাহ্মণপুত্রকে নিয়ে হরিদাস নিজের বাড়িতে এল।

এদিকে হরিদাসের স্ত্রী আর তার পুত্র দুটি সুকুমার গুণবান ব্রহ্মণপুত্রকে নিয়ে এসেছে বাড়িতে, মহাদেবীর সংগে বিয়ে দেবে বলে। হরিদাস, হরিদাসের স্ত্রী, হরিদাসের পুত্র, তিনজন আলাদা আলাদাভাবে কথা দিয়ে ফেলেছে মহাদেবীর সংগে

তাদের বিয়ে দেবে বলে। তিন পাত্রই হরিদাসের বাড়িতে উপস্থিত।
হরিদাস তো মহাসমস্যার সম্মুখীন হল। তিনপাত্রই রূপবান, গুণবান। তিন পাত্রই মহাদেবীর জন্য বাগদত্ত। এ অবস্থায় কার সংগে মহাদেবীর বিয়ে দেওয়া যায়? ভেবে-চিন্তে কিছু ঠিক করতে না পেরে হরিদাস তখন তিন ব্রাহ্মণ পাত্রকে বলল—তোমরা কয়দিন এখানে খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম কর। এর মধ্যে আমি স্ত্রী-পুত্রের সংগে পরামর্শ করে ঠিক করছি কার সংগে মহাদেবীর বিয়ে দেওয়া যায়।
হরিদাসের কথায় তিন পাত্রই রাজী হল। হরিদাসের বাড়িতে তিনজনেই থেকে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিন্ধ্যাচলের এক ভয়ংকর রাক্ষস সেই দিনেই এসে, ঘুমন্ত মহাদেবীকে নিয়ে বিন্ধ্যাচলে পালিয়ে গেল।
পরের দিন সকাল বেলায় সবাই ঘুম থেকে উঠে দেখে মহাদেবী ঘরে নেই, কোথাও নেই। খোঁজ খোঁজ। চারদিক খুঁজে কোন-দিকেও মহাদেবীকে পাওয়া গেল না। মহাদেবীর জন্য সবার মন খারাপ হয়ে গেল।
এই সময়ে তিনজনের মধ্যে একজন পাত্র হরিদাসকে বলল—আপনারা অহেতুক ভাবছেন কেন? আমি যোগবলে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান সব দেখতে পাই। আমি এই মুহূর্তে যোগ বলে দেখলাম এক ভয়ংকর রাক্ষস আপনার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে লুকিয়ে রেখেছে।
এই কথা শুনে দ্বিতীয় পাত্র বলে উঠল—আহ্, তাহলে তো সহজেই কন্যাকে উদ্ধার করা যাবে। আমি যদি কোনও ভাবে

এখনই বিন্ধ্য-পর্বতে যেতে পারি তবে শব্দ-ভেদী বান দিয়ে এক মুহূর্তে রাক্ষসকে মেরে ফেলতে পারি।
দ্বিতীয় পাত্রের কথা শেষ হতেই তৃতীয় পাত্র বলল—তাহলে তো কোন অসুবিধেই নেই। আসুন আমার জাদুরথে। এক পলকে আপনাকে নিয়ে যাব বিন্ধ্যপর্বতে।
তখন তৃতীয় পাত্রের যাদুরথে চড়ে সকলে বিন্ধ্যপর্বতে গেল। দ্বিতীয় পাত্র শব্দ-ভেদী বান মেরে রাক্ষসকে বধ করে মহাদেবীকে উদ্ধার করল। তারপর জাদুরথে চড়ে সকলে মিলে মহাদেবীকে নিয়ে ফিরে এল ধারানগরে।
ধারানগরে ফিরেই শুরু হল গোলমাল। তিন পাত্রই বলে তারই জন্য মহাদেবী রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। তাই মহা-দেবীকে বিয়ে করার যোগ্যপাত্র একমাত্র সেই-ই।
তিনপাত্রের এই ঝগড়া দেখে হরিদাস হতভম্ব হয়ে গেল। সত্যিই, কার হাতে এখন মহাদেবীকে সমর্পন করবে সে?

বেতালের গল্প শেষ হল। বেতাল এবার প্রশ্ন করল—মহারাজ! এই তিনজন পাত্রের মধ্যে মহাদেবীকে বিয়ে করার অধিকারী কে?
রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—রাক্ষসকে শব্দভেদী বানে বধ করে মহাদেবীকে রাক্ষসের হাত থেকে যে উদ্ধার করেছে সে।
—কেন? আবার প্রশ্ন করে বেতাল।
রাজা বিক্রমাদিত্য বলেন—রাক্ষসের হাত থেকে মহাদেবীকে উদ্ধার করার ব্যাপারে তিনজন পাত্রেরই কিছু না কিছু অবদান আছে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে, রাক্ষসকে মেরে কন্যাকে উদ্ধার করাটাই আসল

কাজ। আর সেই আসল কাজটা করেছে যে, কন্যাকে তো সেই-ই পাবে।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে শিরীষ গাছের ডালে আগের মতই প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, আগের মতই কাঁধে ফেলে চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল ষষ্ঠ গল্প........................ ....
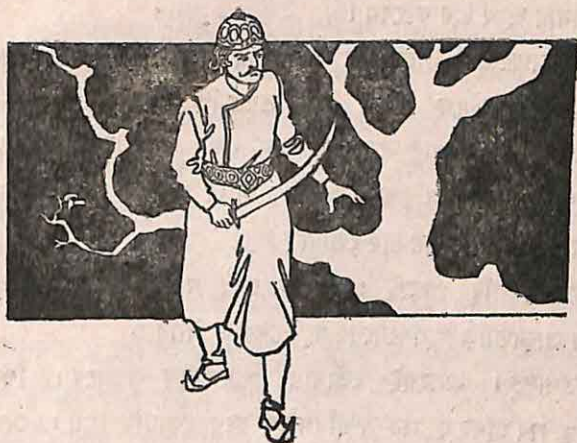
বেতাল বলল—মহারাজ! শোন তবে ষষ্ঠ গল্প—

ধর্মপুর নামে এক প্রসিদ্ধ নগরের রাজা ছিলেন ধর্মশীল। ধর্মশীল খুব ধার্মিক রাজা ছিলেন। রাজা ধর্মশীলের মন্ত্রীর নাম ছিল অন্ধক। মন্ত্রী অন্ধকের পরামর্শে রাজা ধর্মশীল এক সুন্দর মন্দির বানিয়ে সেখানে কাত্যায়নী দেবীকে প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিদিন খুব ধুমধাম করে সেখানে পূজার্চনা হোত। কাঞ্চনময়ী কাত্যায়নী দেবীর পূজা হোত খুব ভক্তিভরে। রাজা ধর্মশীল এই পূজার্চনা করে বড় খুশী হতেন।

এত কিছু সত্ত্বেও রাজার মনে কিন্তু এক গভীর দুঃখ ছিল। এতদিন হয়ে গেল, তবু তাঁর কোন পুত্রসন্তান হোল না। পুত্রের চিন্তা সবসময়েই রাজার মনে কাঁটার মত বিঁধে থাকত। রাজার মনের এই অবস্থা মন্ত্রী অন্ধক জানতেন। তিনিই একদিন

বললেন—রাজা, আপনি কাত্যায়নীর স্মরণ নিন্। তিনিই আপনার দুঃখ দূর করবেন।

মন্ত্রী অন্ধকের উপদেশমত রাজা ধর্মশীল দেবী কাত্যায়নীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে স্তবস্তুতি করলেন। প্রার্থনা করলেন—মা, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আমাকে কৃপা কর। দৈববাণী ভেসে এল—ধার্মিক রাজা, আমি তোমার ওপর খুবই প্রসন্ন। বল, কি বর চাই তোমার?

—দেবী, যদি প্রসন্নই হয়ে থাক, তবে বর দাও, আমি যেন খুব তাড়াতাড়ি পুত্রসন্তানের মুখ দেখতে পারি।

—তথাস্তু। অচিরেই তোমার পুত্রসন্তান জন্মাবে। স্থির, শান্ত, সর্বগুণযুক্ত, সর্বশাস্ত্রবিশারদ্ হবে তোমার পুত্র। দেবী আশীর্বাদ করেন।

দেবীর বরে রাজার পুত্রসন্তান জন্মাল। মহাসমারোহে রাজা ধর্মশীল দেবী কাত্যায়নীর পুজা দিলেন। রাজ্যে আনন্দ উৎসবের বন্যা বয়ে গেল। উৎসবে আগত দীন-দুঃখীকে প্রচুর অর্থদান করে তুষ্ট করলেন রাজা। রাজা ও পুত্রের মঙ্গলকামনা করে গেলেন সবাই।

এই ঘটনার অনেকদিন পর দীনদাস নামে এক তাঁতী কোনও কাজ নিয়ে, রাজধানীতে যাচ্ছিল। সংগে ছিল এক বন্ধু। পথের মাঝে, আর এক তাঁতীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় সেই তাঁতীর পরমাসুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেল দীনদাস। সেই সুন্দরী মেয়েকে দেখে দীনদাস মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করে ফেলল, ঐ মেয়েকেই বিয়ে করব, ব্যস্।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা করার পরপরই মনে হোল, তাইতো, পাই কি করে ঐ মেয়েকে ? হঠাৎ মনে পড়ল দীনদাসের, আরে! আমাদের রাজা ধর্মশীল দেবী কাত্যায়নীর দয়ায় এই বৃদ্ধ বয়সেও পুত্রের মুখ দেখতে পেয়েছেন। এটা যদি সম্ভব হয়, তবে দেবীর দয়ায় আমিই বা কেন সুন্দরী ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারব না।

এই ভেবে দীনদাস কাত্যায়নী মন্দিরে গিয়ে দেবীর কাছে হত্যা দিয়ে পড়ল। বলল—মা, দয়া কর, ঐ তাঁতী মেয়ের সংগে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও। মা, কথা দিচ্ছি, যদি আমার ইচ্ছা পূরণ কর তবে নিজ হাতে আমার মাথা কেটে তোমার পায়ে অর্পণ করব। দীনদাস এত বেশি উত্তেজিত ছিল যে সে কি প্রতিজ্ঞা করে বসল তার হুঁসই থাকল না। সম্মোহিতের মত দীনদাস এরপর বন্ধুর সংগে বাড়িতে ফিরে এল।

দিন যায়। মেয়েটির চিন্তায় দীনদাসের মুখে হাসি নেই, মুখে কথা নেই। কাজে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই দীনদাসের। এই খারাপ অবস্থা দেখে, তার সেই বন্ধু দীনদাসের বাবার কাছে সবকিছু খুলে বলল। জানাল—ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে না পারলে দীনদাস হয়ত না খেয়ে-দেয়ে মারাই যাবে।

ছেলের ব্যাপার-স্যাপার দেখে দীনদাসের বাবাও চিন্তিত ছিলেন। এখন কারণটা বুঝতে পেরে ঠিক করলেন তাঁতী মেয়েটির বাবার কাছে ছেলের বিয়ের প্রস্তাব করবেন।

দীনদাসকে নিয়ে দীনদাসের বাবা এলেন সেই তাঁতীর বাড়িতে, মেয়েটির বাবার কাছে। প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর দীনদাসের বাবা দীনদাসের সংগে সেই তাঁতী মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করলেন। দীনদাসকে দেখে, দীনদাসের বাবার সংগে

আলাপ করার পর তাঁতীরও ওদের খুব ভাল লাগল। তাই বিয়ের প্রস্তাব উঠা মাত্রই রাজী হয়ে গেল। তারপর অল্পদিনের মধ্যে ঐ তাঁতী মেয়ের সংগে দীনদাসের বিয়ে হয়ে গেল। দীনদাস তাঁতী মেয়েকে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগল।
কিছুদিন পরে দীনদাসের শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ হোল। দীনদাস তার স্ত্রী আর সেই বন্ধুকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা হোল। রাজধানীর কাছাকাছি আসতেই কাত্যায়নী মন্দির চোখে পড়ল দীনদাসের।
কাত্যায়নী মন্দির চোখে পড়তেই দীনদাসের মনে পড়ে গেল দেবীর কাছে তার প্রতিজ্ঞার কথা। মনে মনে বলে উঠল দীনদাস —ছিঃ, ছিঃ, দেবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে তা না মেনে একি ঘোর অন্যায় করেছি! আমার যে নরকেও জায়গা হবে না। জন্মজন্মান্তরেও যে এ পাপ থেকে উদ্ধার পাব না। নাঃ, দেবীর কাছে আমার যে ঋণ আছে তা আজই শোধ করব।
এইসব কথা মনে মনে চিন্তা করে দীনদাস বন্ধুকে বলল —ভাই, আমার স্ত্রীর সংগে এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি এখুনি দেবীদর্শন করে ফিরে আসছি। এই বলে মন্দিরে চলে গেল।
মন্দিরের ভিতরের পুকুরে স্নান করে কাত্যায়নীদেবীকে পূজা করল দীনদাস। তারপর দুহাত জুড়ে দেবীকে বলল—মা, বহুকাল আগের মানত আজ পূরণ করছি। এই বলে মন্দিরের মধ্যে রাখা খড়্গ দিয়ে নিজের মাথাটা কেটে ফেলল।
এদিকে বহুক্ষণ কেটে গেছে। দীনদাস ফিরছে না দেখে দীনদাসের বন্ধু দীনদাসের স্ত্রীকে বলল—তুমি একটু অপেক্ষা

কর এখানে। আমি এখুনি দীনদাসকে ডেকে আনছি। এই বলে সে মন্দিরে গিয়ে ঢুকল।
মন্দিরে ঢুকে সে দেখে দীনদাসের ধড় এক জায়গায়, মুণ্ড অন্য জায়গায়। মন্দির-চাতাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বন্ধুর ই অবস্থা দেখে শিউরে উঠল সে! একি সর্বনাশ! কি করা যায় এখন! লোকে নিশ্চয়ই ভাববে মন্দিরে এসে, আমিই দীনদাসকে হত্যা করেছি। অকারণে সবাই আমাকে সন্দেহ করবে। নাঃ, এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। এই কথা চিন্তা করে সেও খড়্গ তুলে নিজের মাথাটা কেটে ফেলল।
বহুক্ষণ কেটে গেছে। স্বামী দীননাথ ফিরল না। তাকে ডাকতে গিয়ে স্বামীর বন্ধুও ফিরল না। কি করি? ভেবে-চিন্তে দীনদাসের স্ত্রী মন্দিরে গেল।

স্বামী আর তার বন্ধুকে ডেকে আনার জন্য কিন্তু মন্দিরে গিয়ে দেখল, তার স্বামী আর স্বামীর বন্ধু, দুজনেই ছিন্নমুণ্ড হয়ে মরে পড়ে আছে। চারদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে।
এই দেখে দীনদাসের স্ত্রী ভাবল, সেই হতভাগিনী। নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের পাপের জন্য তার এই সর্বনাশ হল। বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। এই ভেবে, রক্তমাখা খড়্গ তুলে নিজের মাথা কাটবার উপক্রম করতেই দেবী কাত্যায়নী সশরীরে আবির্ভূত হয়ে তাঁতী মেয়ের হাতটি চেপে ধরলেন, বললেন—মা, তোমার সাহস, বিবেচনা দেখে আমি সন্তুষ্টু হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।
তাঁতী মেয়ে বলে উঠল—দেবী, যদি প্রসন্নই হয়ে থাকেন, তবে আমার স্বামী ও তার বন্ধুর জীবন ফিরিয়ে দিন।

দেবী কাত্যায়নী বললেন, তথাস্তু। তুমি ওদের দুজনের শরীরের সংগে দুজনের কাটা মুণ্ড বসিয়ে দিলেই তারা দুজনে বেঁচে উঠবে। এই বলেই দেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
দেবীর বর পেয়ে আত্মহারা হয়ে যায় তাঁতী মেয়ে। সে তাড়াতাড়ি এসে দুটি শরীরের সংগে দুটি মাথা জোড়া লাগিয়ে দেয়। কিন্তু স্বল্পালোকে ভুল করে বন্ধুর দেহের সংগে জোড়া লাগায় দীনদাসের মাথা, আর দীনদাসের শরীরের সংগে জুড়ে দেয় বন্ধুর মাথা।
শরীর মাথা এক করতেই দুটি শরীর বেঁচে উঠল। একজনের দেহ হল দীনদাসের, মাথা বন্ধুর। আর অন্যজনের দেহ হোল বন্ধুর, মাথা দীনদাসের।

বেতালের গল্প শেষ হল। বেতাল এবার প্রশ্ন করল—বল তো মহারাজ, এখন ঐ দুজনের মধ্যে কন্যার স্বামী হবে কে?
রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—যে শরীরে দীনদাসের মাথা আছে সেই হবে মেয়েটির স্বামী।
—কেন? বেতাল আবার প্রশ্ন করে।
—কারণ, নদীর মধ্যে যেমন উত্তম গঙ্গা, পাহাড়ের মধ্যে উত্তম সুমেরু, গাছের মধ্যে উত্তম কল্পতরু, তেমনি মাথাই শরীরের উত্তম অংশ। মাথা দিয়েই সেজন্য লোককে চিনি।
সঠিক উত্তর শুনে বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে, শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।
রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, আগের মতই কাঁধে ফেলে চলতে লাগলেন।
বেতাল তখন শুরু করল সপ্তম গল্প..............................

বেতালের সপ্তম গল্প
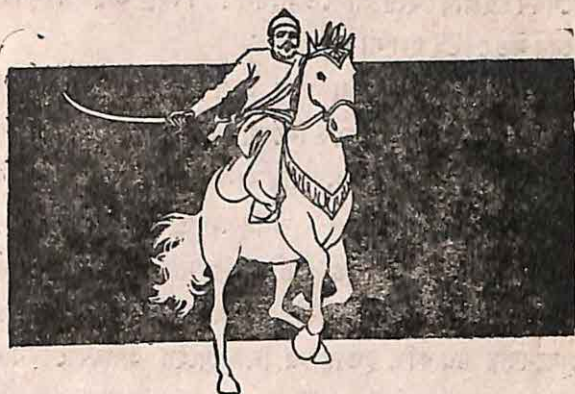
বেতাল বলল—মহারাজ! শোন তবে সপ্তম গল্প—

চম্পানগরের রাজা চন্দ্রাপীড়ের রাণীর নাম ছিল সুলোচনা, আর কন্যার নাম ত্রিভুবনসুন্দরী। ত্রিভুবনসুন্দরী ছিল অতি অপরূপা সুন্দরী।

রাজকন্যা বড় হল। রাজা রাণী মেয়ের বিয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে উঠলেন। রাজা পাত্রের খোঁজ করতে চারদিকে লোক পাঠালেন। রাজকন্যা ত্রিভুবন সুন্দরীর অপরূপ রূপ—লাবণ্যের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানান্ দেশের রাজারা নিজেদের মূর্তি তৈরি করে রাজা চন্দ্রাপীড়ের কাছে পাঠালেন। কিন্তু রাজকন্যার পছন্দ হোল না।

শেষে রাজা চন্দ্রপীড় রাজকন্যার স্বয়ংম্বরার আদেশ দিলেন। কিন্তু ত্রিভুবনসুন্দরী বলল,—না বাবা, আমি স্বয়ংবর চাই না।

বরং যিনি বিদ্যা-বুদ্ধি-বিক্রমে শ্রেষ্ঠ হবেন, তাঁকেই আমি বিয়ে করব।
অচিরেই রাজকন্যার এই কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা জনে বিবাহপ্রার্থী হয়ে আসতে লাগল! কিন্তু তবুও রাজকান্যার মনের মত কেউই হল না।
শেষে বিদেশ থেকে চারজন পাত্র এসে উপস্থিত হোল। তারা একে একে রাজা চন্দ্রপীড়কে নিজের ক্ষমতার কথা বলতে লাগল। প্রথম জন বলল—মহারাজ, আমি বাল্যকাল থেকেই অনেক বিদ্যা-গুণাবলী আয়ত্ত করেছি। আমি প্রতিদিন এমন একটি করে অসাধারণ কাপড় বুনতে পারি যার দাম পাঁচটি রত্নের সমান। এই পাঁচ রত্নের মধ্যে একটি রত্ন ব্রহ্মণকে দান করি, দ্বিতীয় রত্ন দেবসেবায় ব্যয় করি, তৃতীয় রত্ন নিজ দেহের অলংকারে ব্যবহার করি, চতুর্থ রত্ন আমার ভাবী স্ত্রীর জন্য রেখে দিই, আর পঞ্চম রত্ন ব্যয় করে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় খরচাপাতি করি। তাছাড়া, আমি কতটা রূপবান সে তো আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন।
দ্বিতীয় জন বলল—আমি জলচর, স্থলচর, সমস্ত পাখির ভাষাই জানি। তাছাড়া, আমার মত শক্তিশালী লোক আপনি আর এক-জনকেও খুঁজে বার করতে পারবেন না। এছাড়া, আমার চেহারা

তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন।
তৃতীয়জন বলল—মহারাজ, আমি যে কত সুন্দর, সেতো আপনি দেখছেনই। তাছাড়া, আমি সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয়।
চতুর্থজন বলল—মহারাজ, আমার রূপ আপনি নিজেই দেখে নিন। অস্ত্রবিদ্যায় আমার সমকক্ষ এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। এ ছাড়াও আমি শব্দভেদী বাণও ছুঁড়তে পারি।

চারজন পাত্রের রূপ সমান। চারজনের গুণও যথেষ্ট। রাজা চন্দ্রপীড় তাই স্থির করতে পারলেন না কার হাতে রাজকন্যাকে দেবেন। তিনি রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন—দেখ মা, আমার মনে হচ্ছে, এই চারজনের মধ্যেই একজন তোর যোগ্য। এখন তুই ই বল, কাকে তুই বিয়ে করবি ?

রাজার কথায় রাজকন্যা লজ্জায় মাথা নিচু করল। ত্রিভুবনসুন্দরী বুঝতে পারল, এই চারজনের মধ্যে একজন তার যোগ্য। কিন্তু চারজনের মধ্যে কে তার যোগ্য হবে ?

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল এবার প্রশ্ন করল—বল তো মহারাজ, এই চারজন পাত্রের মধ্যে রাজকন্যার উপযুক্ত পাত্র কে ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন–চতুর্থ পাত্র, যিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী।

—কেন ? বেতাল আবার প্রশ্ন করে ?

—কারণ, প্রথম পাত্র কাপড় বোনায় পারদর্শী, অর্থাৎ জাতিতে শূদ্র। দ্বিতীয় পাত্র পক্ষীভাষাবিদ, অর্থাৎ সে বৈশি। তৃতীয় পাত্র সর্বশাস্ত্রবিদ, মানে জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিন্তু চতুর্থ পাত্র অস্ত্র-বিদ্যায় অদ্বিতীয়। অর্থাৎ জাতিতে ক্ষত্রিয়, রাজকন্যার স্বজাতি। তাই যুক্তিমতে স্বজাতি অস্ত্রবিদই রাজকন্যার উপযুক্ত পাত্র।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে, শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, আগের মতই কাঁধে ফেলে চলতে লাগলেন। বেতাল তখন শুরু করল তার অষ্টম গল্প·····················

বেতালের অষ্টম গল্প

বেতাল বলল—মহারাজ! শুনুন তবে অষ্টম গল্প—

মিথিলা নগরে গুণাধিপ নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। রাজা গুণাধিপের নানান্ সদ্‌গুণ ও দয়ালুতার কথা শুনে দক্ষিণদেশীয় এক রাজপুত, চিরঞ্জীব, চাকরি লাভের আশায় সেখানে উপস্থিত হোল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা গুণাধিপের দর্শন পেল না চিরঞ্জীব। কারণ রাজা তখন রাজসভায়ও আসতেন না, রাজকার্যও দেখতেন না, শুধু অন্তঃপুরে রাজমহিষীদের সংগে গল্পগুজব করেই সময় কাটাতেন। এমনি করে একটি বছর রাজসভায় এসেও রাজার দর্শন পেল না চিরঞ্জীব। হাতে জমা টাকাও খরচা হয়ে গেল চিরঞ্জীবের।

এইভাবে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পর সব অর্থ নিঃশেষ হয়ে

যাওয়াতে চিরঞ্জীব ভাবতে শুরু করল—একবছর তো পার হোল। কাজের আশায় মিথ্যে মোহে, বিদেশ থেকে এখানে এসে একবছর অপেক্ষা করলাম। কিন্তু যে রাজা অন্তঃপুরেই রাণীদের সংগে দিন কাটান, একবারও রাজসভায় আসেন না, তার কাছে কাজ পাবার সম্ভাবনাই কম, কারণ অমাত্যরাই রাজকার্য চালাচ্ছেন এই দেশে। এমন দেশে একবছর অপেক্ষা করে শুধু আমি নিঃসম্বল হয়ে গেলাম। এখন ভিক্ষা করা ছাড়া আর আমার উপায় নেই। আমার মত রাজপুতের যখন ভিক্ষা করা সম্ভব নয়, তখন হয় মৃত্যুবরণ করা উচিত, নয়ত সমস্ত কামনা—বাসনা ত্যাগ করে, বনে গিয়ে, তপস্যা করাই উচিত। এইসব নানান্ কথা ভেবে, শেষে চিরঞ্জীব তপস্যা করার জন্যই বনে চলে গেল।
এর কিছুদিন পরে রাজা গুণাধিপের রাজকার্যে মন এল। রাজ-অন্তঃপুর ছেড়ে রাজদরবারে এসে আবার রাজকার্য করতে শুরু করলেন রাজা গুণাধিপ। নিয়মমত প্রতিদিন রাজসভা বসতে লাগল। কিছুদিন পরে রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মৃগয়ায় গেলেন। ঘোড়ায় চড়ে নানান্ বনে শিকার করতে করতে, শেষকালে এক হরিণের পিছনে তাড়া করে, রাজা গুণাধিপ এক গভীর জংগলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। চারদিক জুড়ে গভীর বন। সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে যাচেছ। রাজা ভয় পেয়ে গেলেন।
ভয় আর ক্ষিধে—তৃষ্ণায় কাতর রাজা চারদিকে জলের অন্বেষণ করতে করতে, জংগলের মধ্যে, এক কুটির দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। চিরঞ্জীব তপস্বী হয়ে তখন সেই কুটিরে তপস্যায় মগ্ন। তৃষ্ণার্ত রাজা হাত জোড় করে তপস্বী চিরঞ্জীবের কাছে জল চাইলেন। তপস্বী চিরঞ্জীব সেই মুহূর্তেই তপস্যা

ছেড়ে উঠে রাজাকে সুমিষ্ট ফল ও সুস্বাদু জল খেতে দিল। সেই জল আর সুমিষ্ট ফল খেয়ে রাজার ক্ষিধে-তৃষ্ণা দূর হোল। রাজা অত্যন্ত তৃপ্ত ও খুশী হলেন।

রাজা যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। সুস্থির হবার পর ভাল করে দেখে বুঝতে পারলেন রাজা, তপস্বী প্রকৃত ত্যাগী নন। তাই রাজা তপস্বীকে বিনীত কন্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—প্রভু, আপনি আমার জীবন দান করেছেন, আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, এর জন্য আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। আপনি নিষ্ঠাবান তপস্বীর মত জীবন যাপন করলেও আপনাকে দেখে প্রকৃত সংসারত্যাগী বলে মনে হচ্ছে না। আপনি কে, কেন তপস্যা করছেন, যদি দয়া করে বলেন, তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

রাজার একান্ত অনুরোধে চিরঞ্জীব নিজের পরিচয় দিয়ে বলল — মহারাজ, আমি মিথিলার রাজা গুণাধিপের মহত্ত্ব ও গুণের কথা শুনে তাঁর কাছে চাকরি লাভের আশায় যাই। কিন্তু রাজা রাজকার্য পরিচালনা না করে শুধু অন্তঃপুরেই থাকায়, এক বছর অপেক্ষা করেও রাজদর্শন পেলাম না। সঞ্চিত অর্থও শেষ হয়ে গেল। তখন ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই দেখে সংসারে বিরক্ত হয়ে সন্ন্যাসী হয়েছি। আমি রাজপুত ক্ষত্রিয়। বিষয় বাসনা তাই আজও মনে আছে। এ বিষয়ে আপনার অনুমান ঠিকই মহারাজ।

চিরঞ্জীবের সমস্ত কাহিনী শুনে রাজা মনে মনে অনুতপ্ত—লজ্জিত হলেন। কিন্তু চিরঞ্জীবকে কিছু না বলে চিরঞ্জীবের অনুমতি নিয়ে, সেই রাত্রে সন্ন্যাসী চিরঞ্জীবের পর্ণ কুটিরেই রয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে রাজা গুণাধিপ নিজের পরিচয় দিলেন। চিরঞ্জীবকে নিয়ে এলেন নিজ রাজধানীতে। রাজার প্রিয় অনুচর হয়ে সেখানেই রয়ে গেল চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীবও নিষ্ঠার সংগে, প্রাণপণে রাজা গুণাধিপের সমস্তকাজ করতে লাগল। এমনি করেই দিন চলে যেতে লাগল চিরঞ্জীবের।

একদিন রাজা গুণাধিপ জরুরী কাজে বিদেশে পাঠালেন চিরঞ্জীবকে। জরুরী কাজ সুসম্পন্ন করার পর, রাজ্যের পথে ফিরতে লাগল চিরঞ্জীব। পথে নদীর ধারে, এক সুন্দর মন্দির দেখে পুজো করার জন্য সেই মন্দিরে প্রবেশ করল চিরঞ্জীব। পুজো শেষ করে মন্দিরের বাইরে আসতেই দেখে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপ সুন্দরীকে দেখে তো চোখই ফেরাতে পারে না চিরঞ্জীব। তাই দেখে সুন্দরী মেয়ে বলে উঠল—ও বিদেশী মানুষ, কি ব্যাপার, তুমি অমন করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? কেনই বা এসেছ এখানে?

চিরঞ্জীব তখন সবই বলল। বলল—আমি রাজ-কাজে বিদেশে গিয়েছিলাম। কাজ শেষ করে এখন আবার রাজধানীতে ফিরছি। পথে, এখানে, তোমার মত অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে দেখে আমি মোহিত হয়ে গেছি। তাই মুগ্ধ হয়ে শুধু তোমাকেই দেখছিলাম।

মেয়েটি তখন বলল—বেশ, তুমি সামনের ঐ যে নদী আছে, ওখানে স্নান করে এস, তাহলেই আমি তোমার কথামত কাজ করব।

মেয়ের কথাটা শুনে খুশী হয়ে চিরঞ্জীব সামনের নদীতে ডুব

দিয়ে মাথা তুলতেই কিন্তু চিরঞ্জীব অবাক। দেখে, সে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে। অবাক হয়ে সব সব কিছু ভাবতে ভাবতে চিরঞ্জীব ভেজা জামা কাপড় ছেড়ে, রাজদরবারে গিয়ে রাজা গুণাধিপকে ঘটনাটি খুলে বলল।

এই অদ্ভুত কথা শুনে রাজাও অবাক হলেন। বললেন—চিরঞ্জীব, যেভাবেই হোক্, যত তাড়াতাড়ি পার, ঐ মন্দিরে আমায় নিয়ে চল।

রাজা চিরঞ্জীবকে নিয়ে রথে চড়ে, নদীর ধারে সেই মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছালেন। তারপর মন্দিরে গিয়ে দেবতা দর্শন করে, ভক্তি সহকারে পুজো দিয়ে, প্রণাম করে মন্দিরের বাইরে এলেন। বাইরে আসতেই সেই পরমাসুন্দরী মেয়ে রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। রূপবান রাজা গুণাধিপকে দেখে সুন্দরী মেয়েটিই এবার মোহিত হয়ে গেল। রাজাকে বলল—মহারাজ, আপনি যে আদেশ করবেন, আমি তাই-ই করব।

কথাটা শুনে রাজা গুণাধিপ বললেন—আমার আদেশ মেনে চলতেই যদি চাও তবে আমার প্রিয়পাত্র এই চিরঞ্জীবকে বিয়ে কর।

মেয়েটি অবাক্ হয়ে বলল - সেকি মহারাজ! আমি আপনার রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়েছি। আপনাকেই বিয়ে করব বলে স্থির করেছি। এই অবস্থায় কেমন করে অন্যকে বিয়ে করি বলুন?

রাজা গুণাধিপ বললেন—সুন্দরী, তুমি এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করেছে আমার কথামত কাজ করবে। তাই, সেই প্রতিজ্ঞামত চিরঞ্জীবকে বিয়ে কর।

শেষে রাজার কথায়, মেয়েটি চিরঞ্জীবকে বিয়ে করতে রাজী হল। গন্ধর্বমতে, সেইখানেই চিরঞ্জীবের সংগে অপরূপ সুন্দরী

মেয়েটির বিয়ে দিয়ে, রাজা গুণাধিপ দুজনকেই রাজধানীতে নিয়ে এলেন।

রাজার অনুগ্রহে এইভাবে চিরঞ্জীব স্ত্রীকে নিয়েছে পরমসুখে দিন যাপন করতে লাগল।

বেতালের গল্প শেষ হোল। এবার বেতাল প্রশ্ন করল—বলুন তো মহারাজ, রাজা আর চিরঞ্জীবের মধ্যে কে বেশি উদার ও ভদ্র ?

রাজা বিক্রমমাদিত্য বললেন—চিরঞ্জীব।

—কেন ? আবার প্রশ্ন করে বেতাল।

—রাজা গুণাধিপ শেষদিকে চিরঞ্জীবের অনেক উপকার করলেও, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর রাজাকে ফল ও জল দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে চিরঞ্জীব যে উপকার করেছিল, তার তুলনায় এসব কিছুই নয়।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে, শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, আগের মতই কাঁধে ফেলে চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার নবম গল্প…………………… …

বেতালের নবম গল্প

বেতাল বলল—মহারাজ! শুনুন তবে নবম গল্প—

মগধপুর রাজ্যের রাজা ছিলেন বীরবর। হিরণ্যদত্ত নামে এক ধনী বণিক বীরবরের রাজ্যে বাস করত। সেই বণিকের মদনসেনা নামে এক অপরূপা সুন্দরী কন্যা ছিল।

একদিন বসন্তকালে, মদনসেনা তার সখীদের নিয়ে বনে বেড়াতে গেলেন। ঘটনাচক্রে, সেই বনে ধর্মদত্ত বণিকের ছেলে সোমদত্তও বেড়াতে এসেছিল। বনে ঘুরতে ঘুরতে, সোমদত্ত হঠাৎ মদন-সেনাকে দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

সোমদত্ত মদনসেনাকে গিয়ে বলল—সুন্দরী, তোমার এই অপূর্ব রূপ-লাবণ্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। তুমি আমাকে বিয়ে কর। আর যদি বিয়ে করতে রাজী না হও তবে আমি তোমার সামনেই আত্মহত্যা করব।

মদনসেনা কথাটা শুনে ভয় পেয়ে, সোমদত্তকে বারবার বোঝাতে চাইল, আত্মহত্যা পাপ, এই অনুরোধ অসম্ভব। কিন্তু সোমদত্ত কোন কথাই শুনতে চাইল না। অবস্থা দেখে মদনসেনা বুঝতে পারল তার জন্য এই সুন্দর যুবক নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবে। মদনসেনা ভাবল, এই যুবকটির প্রাণরক্ষা করা আমার কাজ। এদিকে তখন সোমদত্ত হাত জোড় করে অশ্রুসজল চোখে তাকিয়ে আছে মদনসেনার দিকে।

এইসব অবস্থা দেখে মদনসেনা সোমদত্তকে বলল—দেখ, আর পাঁচদিন পরে আমার বিয়ে হবে। বিয়ে হয়ে যাবার পরে আমার শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করছি, বিয়ের পরে, তোমার সংগে দেখা না করে আমি স্বামীর সংগে বসবাস করব না। তুমি আত্মহত্যা না করে বাড়ি যাও।

মদনসেনার এই সান্ত্বনা বাক্যে, খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে গেল সোমদত্ত। মদনসেনাও ফিরে এল নিজের বাড়িতে।

এরপর পাঁচদিন পরে, যথাসময়ে, মদনসেনার বিয়ে হোল। বিয়ের পরে, নিয়মমত, মদনসেনা বরের সংগে শ্বশুরবাড়ি গেল। ফুলসজ্জার রাতে, মদনসেনাকে যখন সবাই বরের ঘরে রেখে চলে এল, তখন মদনসেনা বরকে একলা পেয়ে, সোমদত্তের সংগে বিয়ের আগে যেসব কথা-বার্তা হয়েছে সবই বলল। শেষে বলল, আমি সোমদত্তকে কথা দিয়ে এসেছি তার কাছে একবার যাব বলে। যদি এখন সোমদত্তের কাছে একবার যেতে না দাও, তবে মিথ্যেবাদী বলে প্রতিপন্ন হব আমি। আর তখন আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর কোনও পথই থাকবে না।

মদনসেনার স্বামী প্রথমে মদনসেনাকে অনেক নিষেধ করল।

শেষে যখন দেখল মদনসেনা তার প্রতিজ্ঞা রাখতে বদ্ধপরিকর, তখন বলল—বেশ, যখন প্রতিজ্ঞা রাখতেই চাও, যাও। গিয়ে একবার দেখা করে এসো সোমদত্তের সংগে।

এইভাবে স্বামীর মত নিয়ে, সোমদত্তর বাড়ির দিকে রওনা হোতে বেশ রাত হয়ে গেল। মদনসেনা নানা অলংকারে সেজে, বধূবেশে একাকী চলেছে। এমনি সময়ে পথের মধ্যে, একটি চোর মদনসেনার সামনে এসে হাজির। চোর জিজ্ঞেস করল—কে তুমি ?

চোর জিজ্ঞেস করল,—কে তুমি ? এত গয়নাগাটি পরে কোথায় চলেছ ?

এত গয়নাগাটি পড়ে একলা কোথায় চলেছ? এইভাবে একলা যেতে ভয় করছে না?

মদনসেনা একটুও ভয় না পেয়ে বলল—আমি হিরণ্যদত্ত বণিকের মেয়ে মদনসেনা। প্রতিজ্ঞা রাখার জন্য, বিয়ের পর, এই বধূবেশে সোমদত্তর কাছে যাচ্ছি। এই বলে সমস্ত ঘটনা বলল।

সবশুনে মুচকি হাসল চোর। তারপর সুন্দরী মদনসেনার গা থেকে সমস্ত গহনা খুলে নিতে উদ্যত হোল। মদনসেনা তখন হাতজোড় করে চোরকে বলল—ভাই, আমার সমস্ত কাহিনীই তো শুনেছ। তুমি দেখছ, কথা দিলে প্রাণ গেলেও সেকথা আমি রাখি। সোমদত্তের কাছে আমি যা প্রতিজ্ঞা করেছি তা আমাকে রাখতে দাও। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। আমি ফিরে যাওয়ার সময় এই সমস্ত গহনাই তোমাকে খুলে দিয়ে যাব। চোর মদনসেনার কথা বিশ্বাস করে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। মদনসেনা চলে গেল সোমদত্তর বাড়ির দিকে। তখন মাঝ রাত, চারদিক নিঝুম।

সোমদত্তর বাড়িতে গিয়ে মদনসেনা দেখে সোমদত্ত ঘুমোচ্ছে। মদনসেনা সোমদত্তকে ঘুম থেকে জাগাল।

অভ রাতে মদনসেনাকে বধূবেশে এরকম সেজে আসতে দেখেতো সোমদত্ত অবাক। সোমদত্ত অবাক গলায় বলল—এত রাতে এরকম সেজে কোথা থেকে এলে?

মদনসেনা বলল—তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তাই রাখতে এসেছি। আমার বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ির ফুলসজ্জা থেকে চলে এসেছি, আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞামত একবার দেখা দেব বলে।

সোমদত্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মদনসেনার দিকে। শেষে বলল—তোমার মত সত্যবাদী আমি আর দেখিনি। তোমার প্রতিজ্ঞা থেকে তুমি মুক্ত হোলে। যাও, স্বামীর ঘরে গিয়ে সুখে ঘরকন্না কর।

এবার মদনসেনা সোমদত্তর বাড়ি থেকে নিজের শ্বশুরবাড়ির দিকে ফিরে চলল। যে পথে চোর অপেক্ষা করছে সেই পথ দিয়েই ফিরে চলল। চোর তখনও মদনসেনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। মদনসেনাকে অত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে চোর তো অবাক। জিজ্ঞেস করল—এই গেলে, আর এই ফিরে এলে, ব্যাপার কি? সোমদত্তর সংগে দেখা হয় নি?

মদনসেনা তখন সবকিছুই বলল। এও বলল—প্রতিজ্ঞা রাখার জন্য ফিরে যাওয়াতে, খুশী হয়ে, তক্ষুনি আমাকে ফিরে আসতে দিয়েছে সোমদত্ত।

মদনসেনার সত্যবাদিতা দেখে চোরও খুব খুশী হোল। বলল—তুমি সৎ ও সত্যবাদী। তোমার মত ভালমেয়ের গহনা আমি চুরি করতে চাইনা। তুমি নিশ্চিন্তে এই বেশেই শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাও। এবার মদনসেনা ফিরে এল স্বামীর কাছে শ্বশুরবাড়িতে। স্বামী কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মদনসেনা ফিরে আসাতেও খুশী হোল না। বরং কোনও কথা না বলে, রাগ করে, মুখ ফিরিয়ে বিছানার অন্যধারে শুয়ে থাকল।

বেতালের গল্প শেষ হোল। এবার বেতাল প্রশ্ন করল—বলতো মহারাজ, মদনসেনা, মদনসেনার স্বামী, চোর আর সোমদত্ত, এই চারজনের মধ্যে কে সবচেয়ে ভদ্র?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—চোর।

—কেন ? আবার প্রশ্ন করে বেতাল।

মদনের স্বামী খুশীমনে মদনসেনাকে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যেতে দেয় নি, আর সেইজন্যই মদনসেনা ফিরে এলেও কথা না বলে রাগ করে মুখ ফিরিয়ে ছিল। মদনসেনাকে বিবাহিত দেখে, রাজার ভয়েই ফিরে যেতে দিল সোমদত্ত, মদনসেনার প্রতিজ্ঞা-পালনের নিষ্ঠার জন্য নয়। আর মদনসেনার বিয়ে হয়ে যাবার পর ও স্বামীর সত্যিকার মত নেই জেনেও ওভাবে একাকী রাত্রে অন্যলোকের কাছে যাওয়া উচিত হয় নি। কিন্তু চোরেরা চির-কালই অর্থলোভী। সততা, নিয়ম কানুন, কিছুর মূল্যই তাদের কাছে নেই। শুধু অর্থের মূলাই তাদের কাছে আছে। অথচ সেই চোরই মদনসেনার সত্যবাদিতায় অলংকারের লোভ ত্যাগ করল। সেজন্যই চোরই শ্রেষ্ঠ ভদ্র মানুষ।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে, শিরীষ গাছের ডাল প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, আগের মত কাঁধে ফেলে, চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার দশম গল্প·····························

বেতালের দশম গল্প
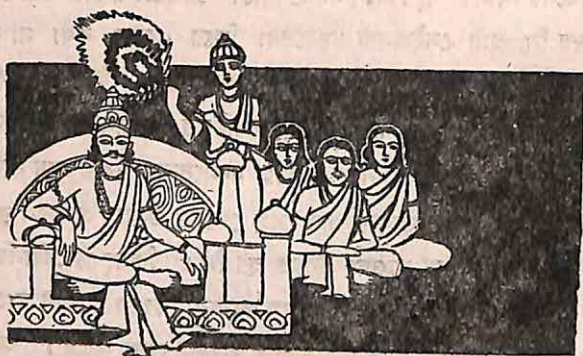
বেতাল বলল—মহারাজ শুনুন দশম গল্প—

গৌড়দেশের বর্ধমান নগরে গুণশেখর বলে একজন রাজা ছিলেন। রাজা গুণশেখরের মন্ত্রী অভয়চন্দ্র ছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। মন্ত্রীর পরামর্শে, রাজা গুণশেখরও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে দেশময় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। হিন্দুধর্ম দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এইসব দেখে রাজপুত্র ধর্মধ্বজ খুব চিন্তিত বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

রাজা গুণশেখরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ধর্মধ্বজ সিংহাসনে বসেই দেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করলেন। মন্ত্রী অভয়চন্দ্রকে মাথা মুড়িয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দেশে হিন্দুধর্মের পুনপ্রচার শুরু করলেন।

এই নতুন রাজা ধর্মধ্বজের তিন রাণী ছিল। একদিন বসন্তকালে

ধর্মধ্বজ তিন রাণীকে নিয়ে উপবনে বেড়াতে গেলেন। সেই উপবনের মধ্যে সুন্দর এক পুকুর ছিল। সেই পুকুরে অজস্র পদ্ম ফুটে ছিল। তাই দেখে, রাজা ধর্মধ্বজ নিজে জলে নেমে; কয়েকটি পদ্মফুল তুলে এনে এক রাণীর হাতে দিলেন। সেই রাণীর হাত থেকে একটি পদ্মফুল পড়ে গেল রাণীর বাঁপায়ের ওপর। পদ্মফুলের আঘাতে তখুনি রাণীর বাঁ-পা ভেঙ্গে গেল। রাজা ধর্মধ্বজ ব্যাকুল হয়ে উঠে রাণীর শুশ্রুষা শুরু করলেন। এদিকে তখন দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে গেছে। সেই চাঁদের কিরণ দ্বিতীয় রাণীর গায়েও পড়েছে। আর সংগে সংগে, সেই চাঁদের কিরণে, দ্বিতীয় রাণীর সমস্ত গা পুড়ে ঝলসে গেল। এই সময়েই উপবনের ধারে, এক গৃহস্থ বাড়িতে, ঢেঁকি চালাবার ধপাস্, ধপাস্, শব্দ আসছিল। সেই শব্দ, তৃতীয় রাণীর কানে যেতেই তাঁর অসহ্য মাথা ধরে গেল। মুর্চ্ছা গেলেন তৃতীয় রাণী।

বেতালের গল্প শেষ হোল। এবার বেতাল প্রশ্ন করল—বলুন তো মহারাজ, তিন রাণীর মধ্যে সবচেয়ে কোমল কে?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—জ্যোৎস্নার কিরণ লেগে যে রাণী পুড়ে গেলেন, তিনিই সবচেয়ে কোমল, সুকুমারী।

সঠিক উত্তর শুনে, বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে, শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, আগের মতই কাঁধে ফেলে চলতে লাগলেন। বেতাল তখন শুরু করল তার একাদশ গল্প……………………

বেতালের একাদশ গল্প
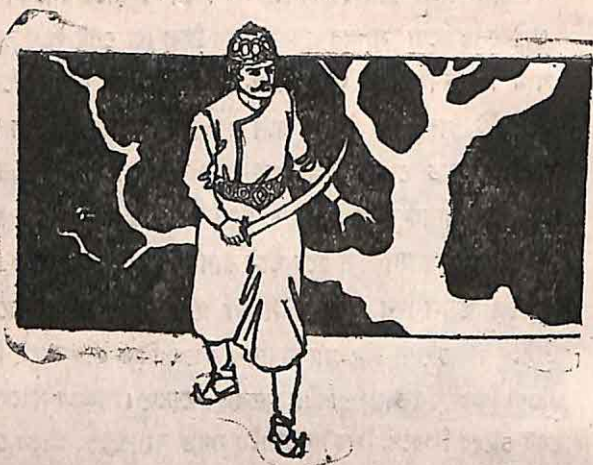
বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে একাদশতম গল্প—পুণ্যপুর নগরে ছিলেন এক প্রজাবল্লভ রাজা, বল্লভ ছিল তাঁর নাম। রাজা বল্লভের মন্ত্রী ছিলেন সত্যপ্রকাশ। একদিন রাজা বল্লভ মন্ত্রী সত্যপ্রকাশকে বললেন—দেখ মন্ত্রী, দীর্ঘকাল রাজ্য পরিচালনা করে আমি বড় ক্লান্ত। নিজের খুশীমত আনন্দ আহ্লাদ কিছুই করতে পারিনি এতদিন। তাই ভাবছি তুমি কিছুদিন রাজ্য পরিচালনা কর, আর আমি বিশ্রাম উপভোগ করি। এই বলে রাজা বল্লভ মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে সুখে বিশ্রাম উপভোগ করতে লাগলেন।

এদিকে মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ দিনরাত কঠোর পরিশ্রমে রাজকার্য পরিচালনা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। একদিন সত্য-প্রকাশ একলা চিন্তিত মনে, নিজের বাড়িতে, এককোণে বসে

আছেন। তাই দেখে, তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার? আজকাল তোমাকে সবসময়েই মনমরা, আর চিন্তাগ্রস্থ হয়ে বসে থাকতে দেখি কেন? তাছাড়া, ক্রমেই তুমি দুর্বল, শীর্ণ হয়ে যাচ্ছ কিসের জন্য?

মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ বললেন - রাজা রাজ্য পরিচালনার ভার আমার হাতে দিয়ে নিজে বেশ সুখে আনন্দ উপভোগ করছেন। আর রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, এইসব গুরুদায়িত্ব একলাই বহন করতে করতে আমি শ্রান্ত, শীর্ণ হয়ে যাচ্ছি।

স্ত্রী লক্ষ্মী বললেন—তুমি তো অনেকদিন একলাই সুন্দরভাবে রাজ্য পরিচালনা করলে। এখন রাজার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে কিছুদিন তীর্থ ভ্রমণ করলেই তোমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ স্ত্রীর কথামত রাজার কাছে গিয়ে ছুটি নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। নানান তীর্থ ঘুরতে ঘুরতে শেষে এসে পেঁাছালেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। সমুদ্রের ধারে মহাদেব রামেশ্বরমের মন্দির। মন্দিরে মহাদেবকে দর্শন করে বাইরে আসতেই সত্যপ্রকাশ দেখতে পেলেন সমুদ্রের নীল জলের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল অপূর্ব সোনার গাছ। আর সেই সোনার গাছের ডালে বসে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী মেয়ে বীণা বাজিয়ে সুমিষ্ট স্বরে গান গাইছে। সত্যপ্রকাশ সত্যপ্রকাশ অবাক হয়ে, একদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ পরে, সেই সোনার গাছ হঠাৎ আবার সমুদ্রের জলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এই অপূর্ব অদ্ভুত ঘটনা দেখে সত্যপ্রকাশ দ্রুত রাজ্যে ফিরে

সোনার গাছ সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠে এল।

এসে রাজা বল্লভকে সমস্ত ঘটনা জানালেন। মন্ত্রীর কছে সবকিছু শুনে রাজা বল্লভও ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। মন্ত্রী সত্যপ্রকাশের হাতে আবার রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে সেতুবন্ধ রামেশ্বরমের দিকে রওনা হলেন।

রাজা বল্লভ রামেশ্বরমে পেঁাছিয়ে, মহাদেবের পুজো শেষ করে এসে দাঁড়ালেন সমুদ্রের সামনে। আর ঠিক তখনই দেখতে পেলেন, সত্যপ্রকাশের বলা গল্পের সেই সোনার গাছ সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠে এল। গাছের ডালে বসে বীণা বাজিয়ে গান গাইছে অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে।

রাজা বল্লভ এই অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখে আর তার গান শুনে এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে কিছু ভাবনা চিন্তা না করেই তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনার গাছকে চেপে ধরলেন। গাছটাও রাজা বল্লভকে নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে শেষে এসে পেঁাছাল পাতালে।

পাতালে এসে পেঁাছাবার পর সেই অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে রাজাকে জিজ্ঞেস করল– তুমি দেখছি খুব সাহসী, বীর। তুমি কে? এখানে এভাবে এসেছ কেন?

রাজা বললেন—আমি পুণ্যপুরের রাজা বল্লভ। আমি তোমার রূপে আর গানে এত মুগ্ধ হয়েছি যে তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই।

রাজার কথা শুনে সুন্দরী মেয়ে বলল—আমিও তোমার সাহসে মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যদি কথা দাও যে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিনে তুমি আমার সংগে দেখা করবে না, কোনও সম্পর্ক রাখবে না, তবেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি।

রাজা বল্লভ এই কথাতেই রাজী হলেন। তারপর গন্ধর্বমতে দুজনের সেদিনই বিয়ে হয়ে গেল। রাজা বল্লভ নতুন রাণীকে নিয়ে পাতাল দেশেই সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এইভাবে চলতে চলতে কৃষ্ণা-চতুর্দশীর দিন এসে উপস্থিত হল। রাজা বল্লভ তাঁর প্রতিজ্ঞামত তৎক্ষণাৎ সেই বাড়ি ছেড়ে, সেদিনের জন্য অন্য জায়গায় চলে গেলেন। কিন্তু রাজা বল্লভ ভাবতে লাগলেন,—কি ব্যাপার? রাণী শুধু কৃষ্ণা-চতুর্দশীর দিনই কেন তাঁর কাছে আমাকে থাকতে নিষেধ করেছে? নাঃ, এই কারণটা না জানা পর্যন্ত আমি সুস্থির হতে পারছি না। এইসব ভেবে, রাজা বল্লভ লুকিয়ে ব্যাপারটা কি লক্ষ্য করতে লাগলেন। সমস্ত দিনমান কেটে গেল, রাত হোল। শেষে, মাঝরাতে এক ভয়ংকর রাক্ষস এসে হাজির হোল রাণীর সামনে। তারপর রাণীকে ধরে মারতে লাগল।

তাই দেখে রাজা বল্লভ রেগে গিয়ে এক খড়্গ নিয়ে এসে তক্ষুণি মুণ্ডু কেটে ফেলল রাক্ষসের।

রাক্ষস বধ হওয়ায় খুশী হয়ে উঠলেন রাণী। রাণী বললেন— রাজা, এতদিনে তুমি আমার সত্যিকার প্রাণ রক্ষা করলে। এই রাক্ষসের জন্য এতদিন বড় দুঃখে আমি দিন কাটিয়েছি।

রাজা বল্লভ জিজ্ঞেস করলেন—রাণী, তুমি এতদিন এই রাক্ষসের হাতে এত যন্ত্রণা সহ্য করেছ কেন?

রাণী বলেলন,—শুনুন তবে মহারাজ আমার দুঃখের কাহিনী। আমি গন্ধর্বরাজ বিদ্যাধরের মেয়ে। রত্নমঞ্জরী আমার নাম। গন্ধর্বরাজ যখন প্রতিদিন খেতে বসতেন তখন তাঁর সামনে আমি বসে না থাকলে তাঁর খাওয়া হোত না। একদিন খেলাধুলায়

আমি এতই মত্ত ছিলাম যে গন্ধর্বরাজ খেতে বসলেও আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসতেই ভুলে গেলাম। ফলে সেদিন বাবার খাওয়া হোল না। রাগে তক্ষুনি আমায় অভিশাপ দিলেন, "তুই আজ থেকে পাতালে থাকবি, আর প্রতি কৃষ্ণা-চতুর্দশীর দিন এক রাক্ষস এসে তোকে অনেক যন্ত্রণা দেবে।" বাবার অভিশাপ শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। আমি গন্ধর্বরাজের পা ধরে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলাম, বললাম, "ক্ষমা কর বাবা। বল এই শাপ থেকে মুক্তি পাব কি করে? আমার কান্না দেখে বাবারও মনে কষ্ট হোল। গন্ধর্বরাজ তখন বললেন, "যেদিন এক বীরপুরুষ এসে রাক্ষসকে মেরে ফেলবে, সেদিনই তোর শাপমুক্তি হবে।" মহারাজ, আজ রাক্ষসকে মেরে আপনি আমায় পিতৃ-অভিশাপ থেকে মুক্ত করলেন। মহারাজ, দীর্ঘকাল এই পাতালে থেকে আমি বহু যন্ত্রণা ভোগ করেছি। এবার অনুমতি দিন, বাবার কাছে গন্ধর্বলোকে ফিরে যাই।

রাজা বল্লভ বললেন—রাণী, তুমি যদি মনে করে থাক আমি সত্যিই তোমরা উপকার করেছি তবে গন্ধর্বলোকে যাবার আগে কিছুদিন আমার সংগে আমার রাজধানীতে বসবাস কর।

রত্নমঞ্জরী রাজী হলেন। রাজা বল্লভের সংগে চলে এলেন পুণ্যপুর রাজ্যে। কিছুদিন সেখানে থাকার পরে, রাণী রত্নমঞ্জরী, বাবার কাছে গন্ধর্বলোকে ফেরার জন্য আবার অনুমতি চাইলেন। রাজা বল্লভ অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হলেন।

কিন্তু রাণী রত্নমঞ্জরীই বললেন এবার—মহারাজ, আমি বহুদিন আপনার সংগে থেকে, মানুষের সংগে ঘর করে, গন্ধর্বলোকের স্বভাব গুণাবলী নষ্ট করে ফেলেছি। তাই এখন গন্ধর্বলোকে

গেলে বাবার কাছে আগের মত আদর-যত্ন পাব না। তাই আমি এখানেই আজীবন থেকে যাচ্ছি।

রাণীর কথা শুনে রাজা বল্লভতো খুব খুশী। তিনি রাজকাজ ছেড়ে, রাণী রত্নমঞ্জরীকে নিয়ে দিনরাত রাজঅন্তঃপুরেই রয়ে গেলেন।

এইসব দেখে মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করলেন।

বেতালের গল্প শেষ হোল। এবার বেতাল প্রশ্ন করল—বলতো মহারাজ, কেন মন্ত্রী সত্যপ্রকাশ মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করলেন? রাজা বিক্রমাদিত্য বলেলন—সতাপ্রকাশ দেখল রাজা আবার রাজকার্য্য ছেড়ে আমোদ প্রমোদ মত্ত হলেন। ফলে প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখার কেউ রইল না, প্রজারা অনাথ হোল। ফলে, যে রাজ্যের এই দুর্গতি হবে, সেই রাজ্যের মন্ত্রীকেও প্রজারা আর সম্মান দেখাবে না। এইসব দুশ্চিন্তায় শেযে মন্ত্রী দুঃখে প্রাণত্যাগ করলেন।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে, শিরিষ গাছের ডালে প্রলাম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যেও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, আগের মতই কাঁধে ফেলে চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার দ্বাদশ গল্প........................

বেতালের দ্বাদশ গল্প

বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে দ্বাদশ গল্প…

চূড়াপুর শহরে দেবস্বামী নামে রূপবান, বিদ্যান, অর্থবান ব্রাহ্মণ ধনপতি বাস করতেন। তাঁর স্ত্রী, লাবণ্যবতীও ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। দেবস্বামী আর লাবণ্যবতী সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। এমনি সময়ে একদিন গ্রীষ্মকালে, অত্যধিক গরমের জন্য দেবস্বামী আর লাবণ্যবতী তাদের উঁচু অট্টালিকার ছাদে শুয়ে ছিলেন। সেই সময়ে, এক গন্ধর্ব, আকাশপথে যেতে যেতে, সুন্দরী লাবণ্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে, সেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাকে রথে তুলে পালিয়ে গেল।

এদিকে কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণের ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু পাশে স্ত্রী লাবণ্যবতীকে দেখতে না পেয়ে চারিদিকে তাকে খুঁজতে লাগলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পরেও লাবণ্যবতীকে খুঁজে পেলেন

না দেবস্বামী। শেষে মনের দুঃখে, ব্রাহ্মণ সংসার ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। সন্ন্যাসীর বেশে, দেশে দেশে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন লাবণ্যবতীকে।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন দুপুরবেলায় ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে। দেবস্বামী বললেন—আমি বড় ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু খেতে দিয়ে প্রাণরক্ষা কর।

গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি একবাটি দুধ এনে খেতে দিল দেবস্বামীকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আগেই সেই দুধে বিষাক্ত কালসাপ এসে মুখ দেওয়ায় ঐ দুধ পূর্বেই বিষাক্ত হয়েছিল। ফলেই, সেই দুধ পান করে সংগে সংগেই দেবস্বামীর শরীর অবশ হয়ে গেল। দেবস্বামী বলে ওঠেন—ব্রাহ্মণ, তুমি ব্রহ্মহত্যা করলে! কথাটা বলেই বিষক্রিয়ায় মাটিতে ঢলে পড়ে মারা গেলেন দেবস্বামী।

এইভাবে হঠাৎ ব্রহ্মহত্যা হতে দেখে গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ব্রাহ্মণীকে গালাগালি করে বললেন—ছিঃ, ছিঃ, তুই দুধের মধ্যে বিষ মিশিয়ে রেখে এই ব্রহ্মহত্যা করলি! তোর মত পাপিষ্ঠার মুখ আমি আর দেখতে চাই না। দূর হ বাড়ী থেকে। —এই বলে গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বার করে দিল।

বেতালের গল্প শেষ হোল। এবার বেতাল প্রশ্ন করল—বলতো মহারাজ, এই ব্রহ্মহত্যার জন্য কার দোষ বেশি?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—কালসাপ ব্রহ্মহত্যার জন্য দোষী নয়। কারণ কালসাপের মুখে তো চিরকালই বিষ থাকে। আর

কালসাপ দুধ ভালবাসে। সেজন্য সেই দুধে কালসাপ মুখ দিয়ে কোনও অন্যায় করেনি। আবার দুধে যে বিষ রয়েছে একথা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কেউই জানতেন না। তাই অতিথি ব্রাহ্মণ দেবস্বামীকে সেই দুধ খেতে দিয়ে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীও কোন অপরাধ করেনি। কিন্তু সবকিছু খবর না নিয়ে, অন্যায় দোষারোপ করে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েই অপরাধ করেছেন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। তাই ব্রাহ্মণই অপরাধী।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধে ফেলে আগের মতই চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার ত্রয়োদশ গল্প.....................

বেতালের ত্রয়োদশ গল্প

বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে ত্রয়োদশ গল্প—
রণবীর বলে এক শক্তিশালী রাজা চন্দ্রহৃদয় নগরে বাস করতেন। প্রজারা নিশ্চিন্তে, নিরাপদে রণবীরের রাজত্বে বাস করত।
কিন্তু একবার সেই নগরে ভীষণ চুরি শুরু হোলো। নগরবাসীরা চোরের উপদ্রবে দিনে দিনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। শেষকালে কোনও উপায় না দেখে, নগরবাসীরা রাজা রণবীরের কাছে গিয়ে নিজেদের দুঃখের কথা জানাল। রাজা সব শুনে আশ্বাস দিলেন, —দেখ, যা হবার হয়ে গেছে। আর যাতে চুরি না হয় সে ব্যবস্থাই আমি করছি।
রাজার আশ্বাসবাণীতে প্রজারা নিশ্চন্ত মনে ঘরে ফিরে গেল। রাজাও নগরের সবদিকে নতুন নতুন পাহারাদার বসালেন। হুকুম জারী করলেন, চোরকে ধরা মাত্রই তাকে শূলে দেবে।

রাজার সব চেষ্টাই কিন্তু বিফল হোল। বরং চুরির মাত্রা বেড়েই গেল। নগরবাসীরা চোরের এই অত্যাচারে নিরুপায় হয়ে, আবার এল রাজার কাছে।

রাজা এবার বললেন—ঠিক আছে, পাহারাদার দিয়ে যখন চুরি বন্ধ হোল না, তখন আমিই নিজে পাহারা দিয়ে দেখব চুরী বন্ধ হয় কিনা? রাজার এই কথায় খুশী হয়ে নগরবাসীরা যে যার ঘরে ফিরে গেল।

এরপর সন্ধে গড়িয়ে রাত্রি হলে, রাজা রণবীর গোপনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, ছদ্মবেশে, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন চোর ধরার জন্য। রাজা একা একা এ রাস্তা ওরাস্তা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে রাজা সামনেই এক অপরিচিত লোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কে গো তুমি? তোমার বাড়ি কোথায়? চলেছই বা কোথায়?

লোকটি ছদ্মবেশী রাজাকে একপলক দেখে নিয়ে বলল,—আমি চোর। তা বাপু তুমিই বা কে? আমার পরিচয় জানতে চাইছ কেন?

ছদ্মবেশী রাজা রণবীর বললেন—আরে! আমিও তো চোর। তাই তুমি কে জানতে চাইছিলাম।

ছদ্মবেশী রাজার কথা শুনে চোরতো মহাখুশী। চোর বলল—ভালই হোল। চল আজকে দুজনে মিলে একসংগে চুরি করতে যাই।

ছদ্মবেশী রাজা চোরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। চোর তখন রাজাকে নিয়ে হাজির হোল এক ধনবান বণিকের বাড়িতে। অনেক ধনদৌলত চুরি করে, চোর রাজাকে নিয়ে চলল নগরের

বাইরে। তারপর এক গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে মাটির নিচের পাতালপুরীতে গিয়ে হাজির হোল। সেই পাতালপুরীতে এক অট্টালিকায় বাস করত এই ধুরন্ধর চোর। চোর রাজাকে নিজের বাড়ির দরজার সামনে বসিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। রাজাও অপেক্ষা করতে লাগলেন চোরের জন্য।

এই সময়ে চোরের বাড়ির ভিতর থেকে একজন বুড়ি দাসী বাইরে এসে রাজা রণবীরের সংগে কথা বলতে লাগল। কথা বলতে বলতে রাজার সত্যিকার পরিচয় জেনে ফেলল। তখন দাসী বলল—মহারাজ! আপনি সর্বনাশ করেছেন। আপনি যে ভয়ংকর দস্যুর সংগে তার বাড়িতে এসেছেন। দস্যু আসার আগেই পালান, না হলে দস্যু এসেই আপনাকে মেরে ফেলেবে।

দাসীর কথা শুনে রাজা চিন্তিত হয়ে বললেন—আমি পালাব কি করে? আমি তো পথ চিনি না। যদি তুমি পালাবার পথ দেখিয়ে দাও তাহলেই আমার প্রাণ বাঁচে।

দাসী পালাবার গোপন পথ রাজাকে দেখিয়ে দিল। রাজাও সেই পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের রাজ্যে, রাজবাড়িতে ফিরে এলেন। পরদিন সকাল হতেই রাজা বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে চোরের বাড়িতে এসে চোর-দস্যুকে আক্রমণ করলেন।

এদিকে এই পাতালপুরী রক্ষা করত এক ভয়ংকর রাক্ষস। চোর বিপদ বুঝে রাক্ষসের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল, রাক্ষসকে নিজের বিপদের কথা জানাল। রাক্ষসকে খুশী করার জন্য অনেক খাবার দাবার দিল। রাক্ষস এতসব খাবার পেয়ে খুশী হয়ে বলল—ভয় নেই, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার সমস্ত সৈন্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছি।

এই বলে রাক্ষস এসে রাজার সৈন্যদলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজার ঘোড়া, হাতি, সৈন্যসামন্ত, সামনে যাকেই পেল, তাকেই কপ্ কপ্ করে গিলে ফেলতে লাগল। এমনি করে রাজার প্রায় সমস্ত সৈন্য, ঘোড়া-হাতি, সব কিছু খেয়ে ফেলল রাক্ষস। তাই দেখে বাদবাকী সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে গেল। বিপদ বুঝে রাজাও পালাতে লাগলেন।

এইভাবে রাজা সৈন্যসামন্ত ধ্বংস হতে দেখে চোরের বিক্রমও সাহস বেড়ে গেল। চোরই রাজার পিছনে পিছনে রাজাকে তাড়া করতে লাগল আর চিৎকার করতে লাগল—ছিঃ, ছিঃ, ভীরু কাপুরুষ রাজা। তোকে ধিক্। তুই ক্ষত্রিয় হয়ে যুদ্ধে হেরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাচ্ছিস? তুইতো ক্ষত্রিয়কুলের কুলাঙ্গার। একথা শুনলে সবাই তোকে ধিক্কার দেবে। ছিঃ —

চোরের ধিক্কার শুনে রাজার চেতনা ফিরে এল। তিনি শুধুমাত্র খড়্গ হাতেই এবার চোরের সংগে লড়াই করতে শুরু করলেন। চোরের সংগে ঘোরতর সংগ্রাম হোল। শেষে চোরকে যুদ্ধে পরাজিত করে, তাকে বেঁধে, রাজধানীতে নিয়ে এলেন রাজা রণবীর।

রাজার আদেশে, পরের দিন সকালে চোরলে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরময় ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হোল। তারপর তাকে শূলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল।

এদিকে চোরকে যখন গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরময় ঘোরান হচ্ছিল, তখন তা দেখে সবাই খুব খুশী হচ্ছিল। কিন্তু চোরকে যখন বণিক ধর্মধ্বজের বাড়ির সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন বণিকের মেয়ে শোভনা জানলা থেকে চোরকে দেখে মুগ্ধ হয়ে
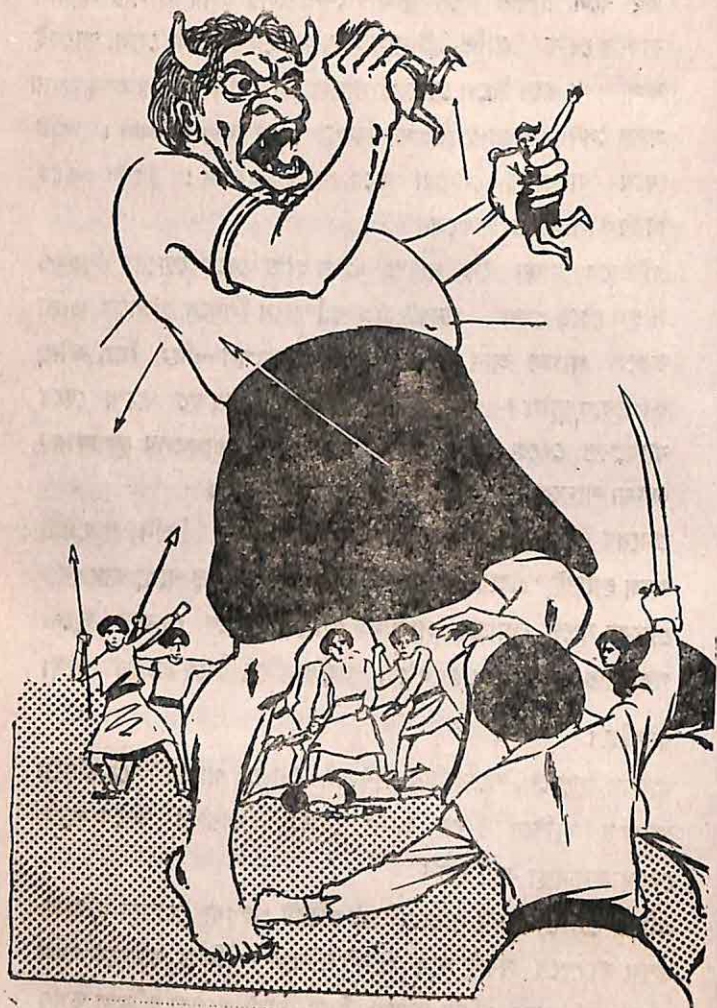
রাক্ষস যাকে পেলো টপাটপ গিলতে শুরু করল।

গেল। শোভনা ধর্মধ্বজকে গিয়ে বলল—বাবা, যেভাবেই হোক চোরকে উদ্ধার কর। ঐ চোরকেই আমি বিয়ে করব। আর যদি তা না কর তবে আমি আত্মহত্যা করব।

ধর্মধ্বজ মেয়েকে খুব ভালবাসত। বেচারা কি আর করে? শেষে রাজা রণবীরের কাছে গিয়ে বলল—মহারাজ, আমার যত টাকা পয়সা আছে সব রাজকোষে দিয়ে দেব, শুধু তার বদলে চোরকে ছেড়ে দিন।

রাজা রণবীর বললেন—সে কি কথা! এই চোর রাজ্যের বহু লোকের সর্বনাশ করেছে। আমার বহু সৈন্যসামন্ত, ঘোড়া-হাতিকে মেরে ফেলেছে। এই চোরকে কিছুতেই মুক্তি দিতে পারি না।

ধর্মধ্বজ তখন মেয়েকে গিয়ে বলল—নারে, কিছুই হোল না। আমার সমস্ত সম্পত্তি রাজাকে দিয়ে দেব বলাতেও রাজা চোরকে ছাড়লেন না।

এদিকে শোভনার এই অদ্ভুত ইচ্ছের কথা রাজ্যময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। এমনকি বধ্যভূমিতে চোরের কানেও সেই কথা পৌঁছিল। চোর সব কিছু শুনে প্রথমে খুব হাসতে লাগল, শেষে আবার কাঁদাত শুরু করল। এর পরই রাজার অনুচরা চোরকে শূলে চড়াল।

চোরের মৃত্যুসংবাদ শোভনার কানে পেঁছাতেই শোভনা বধ্য-ভূমিতে ছুটে এল সহমরণে যাবে বলে। শেষকালে চোর আর শোভনার চিতা একসংগে পাশাপাশি সাজান হোল। চোরের চিতার সঙ্গে পাশে শোভনার চিতাতেও আগুন জ্বালান হোল। এমনি সময়ে দেবী কাত্যায়ণী আবির্ভূতা হয়ে শোভনাকে বললেন

—বৎসে! তোমার সাহস ও সততা দেখে আমি মুগ্ধ। বল কি বর চাও?

শোভনা বলল—মা! যদি সত্যিই সন্তুষ্ট হয়ে থাক তবে এই চোরকে বাঁচিয়ে দাও।

দেবী কাত্যায়নী আশীর্বাদ দিলেন, বললেন,—তথাস্তু। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। চোর বেঁচে উঠল। দেবীও অদৃশ্য হলেন।

বেতালের গল্পশেষ হল। বেতাল প্রশ্ন করল—বলতো মহারাজ, চোর প্রথমে হাসলই বা কেন, শেষে কেনই বা কাঁদল?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন - চোর ভাবল, কি অদ্ভুত ব্যপার! আমি যখন শূলে চড়ে মরতে যাচ্ছি তখন কিনা এই মেয়েটা আমায় ভাল বাসল? এই ভেবেই চোর প্রথমে হেসে ছিল। তারপরই চোর ভাবল, আমায় মত চোরের জন্যও ঐ মেয়ে তাদের সর্বস্ব রাজাকে দিতে চেয়েছিল! কিন্তু আমি মেয়ের কি উপকারে আসতাম। কি দিতে পারতাম মেয়েটাকে। এই কথা ভেবেই শেষে কেঁদেছিল চোর।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে, শিরিষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতলকে নামিয়ে, কাঁধে ফেলে, আগের মতই চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার চতুর্দশ গল্প........................

বেতালের চতুর্দশ গল্প
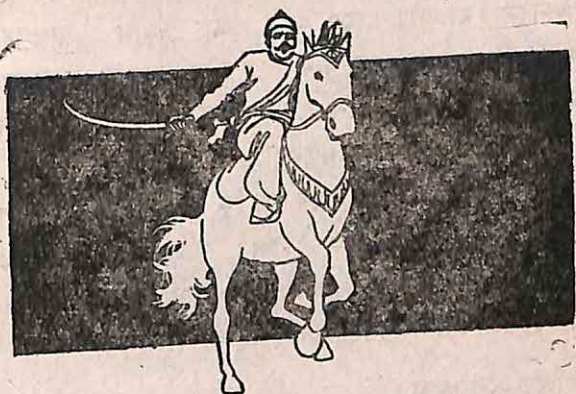
কুসুমবতী নগরের রাজার নাম ছিল সুবিচার। তাঁর এক পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল, নাম চন্দ্রপ্রভা। চন্দ্রপ্রভা একদিন বসন্তকালে বনে বেড়াতে যাবেন ঠিক করে রাজার কাছে অনুমতি চাইলেন।

রাজা সুবিচার কন্যার ইচ্ছা পূরণের জন্য কিছুদূরের যোজনবিস্তৃত এক উপবনকে শুধুমাত্র মেয়েদের উপযোগী করে তোলার জন্য লোকজনকে পাঠালেন। তারা সেই উপবনকে সেইভাবে তৈরি করলো, রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভা সখীদের দিয়ে সেই উপবনে বেড়াতে গেলেন।

কিন্তু এদিকে রাজার লোকরা সেই উপবনে গিয়ে উপবনকে মেয়েদের উপযোগী করে তোলার আগেই মনস্বী নামে এক বিদেশী ব্রাহ্মণ সেই উপবনের মধ্যে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে

ছিল। রাজার লোকেরা তাকে দেখতেও পায় নি, বুঝতেও পারে নি। মনস্বী তাই সেই উপবনে ঘুমিয়েই থাকল।

এরপর রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভা সেই উপবনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ব্রাহ্মনকুমার মনস্বীর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। রাজকুমারী আর সখীদের পায়ের শব্দ ঘুম ভেঙ্গে গেল মনস্বীর। রাজকন্যা আর ব্রাহ্মণকুমার দুজনে দুজনকে দেখেতো মুগ্ধ হয়ে গেল। কেউ কারুর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না।

সখীরা রাজকন্যার অবস্থা দেখে তো কি করবে ভেবে উঠতে পারে না। শেষে তাদেরও সম্বিত ফিরল। রাজকন্যাকে নিয়ে তারা তাড়াতাড়ি রাজপ্রাসাদে ফিরে এল। এদিকে, হঠাৎ রাজকন্যাকে এভাবে চলে যেতে দেখে ব্রাহ্মণকুমার মনস্বী দুঃখে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে ঢলে পড়ল।

সেই সময়ে শশী আর ভূদেব নামে দুই ব্রাহ্মণপুত্র কামরূপ কামাখ্যা থেকে কামরূপী বিদ্যা শিখে দেশে ফিরছিল। পথে এই উপবন দেখে বিশ্রামের জন্য, উপবনের গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল তারা। আর তখনই নজর পড়ল মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে এক ব্রাহ্মণকুমার।

ভুদেব আর শশী সেবা শুশ্রুষা করে মনস্বীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। মনস্বীর জ্ঞান ফিরতে, তাকে জিজ্ঞেস করল—কে তুমি? এভাবে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে এই উপবনে পড়ে আছ কেন?

মনস্বী বলল—মনের দুঃখে আমি এখানে পড়ে আছি। যে আমার দুঃখ দূর করতে পারবে তাকেই আমার দুঃখের কাহিনী জানাব। অন্য লোককে সে সব কথা জানিয়ে লাভ কি?

ভূদেব বলল,—আমি কথা দিচ্ছি, তোমার দুঃখ আমিই দূর

করব। বল এবার, তোমার কিসের দুঃখ?

ভূদেবের আশ্বাসবাণী পেয়ে মনস্বী বলল—দেখ ভাই, কিছুক্ষণ আগে অল্পক্ষণের জন্য এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে আমি দেখেছি। অল্পক্ষণের জন্য দেখা দিয়েই সেই সুন্দরী মেয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে না পারলে আমি প্রাণই বিসর্জন দেব।

ভূদেব কামাখ্যা বিদ্যার জোরে মুহূর্তে জেনে নিল সেই সুন্দরী মেয়ে রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভা। তখন ভূদেব মিষ্টি হেসে বলল—আমি তোমার সংগে নিশ্চয়ই তার মিলন ঘটিয়ে দেব। চল আমার সংগে আমার বাড়িতে। এই বলে মনস্বীকে নিয়ে ভূদেব ও শশী বাড়িতে ফিরে এল।

বাড়িতে এসে ভূদেব মনস্বীক বলল—দেখ, তোমাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি। এই মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করলেই তুমি ষোল বছরের সুন্দরী মেয়েতে রূপান্তরিত হবে। আবার যখন ইচ্ছে করবে, তখন মনে মনে চাইলেই নিজ মূর্তিতে ফিরে আসবে। দেখ না, তারপর কি করি।

এরপর ভূদেব মন্ত্রটি শেখাতেই মনস্বী ফুটফুটে ষোল বছরের মেয়েটি হয়ে গেল। আর ভূদেব কামাখ্যা মন্ত্রবলে হয়ে গেল আশী বছরের থুত্থুড়ে বুড়ো। থুত্থুড়ে বুড়োরূপী ভূদেব ষোল বছরের কিশোরীরূপী মনস্বীকে বৌ সাজিয়ে নিয়ে চলল রাজা সুবিচারের কাছে।

বৃদ্ধরূপী ভূদেবকে রাজদরবারে পেঁছাতে দেখেই রাজা সুবিচার সসম্মানে তাকে বসবার আসন দিলেন। বললেন—বলুন ব্রাহ্মণ, আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?

বৃদ্ধরূপী ভূদেব বলল—আমি গঙ্গার পূবপারের মানুষ। আমার সংগে এই যে কিশোরীকে দেখছেন, এটি আমার পুত্রবধূ। পুত্রবধূকে তার বাপের বাড়ি থেকে আনতে যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, বাড়িতে ফিরে দেখি ওলাউঠায় আমাদের গ্রাম ছারখার হয়ে গেছে। ওলাউঠার ভয়ে আমার ব্রাহ্মণী আর আমার একমাত্র বিশ বছরের ছেলেও কোথায় যেন চলে গেছে। চারদিকে খুঁজেও স্ত্রী পুত্রের সন্ধান না পেয়েই আপনার কাছে এসেছি। এই পুত্রবধূকে নিয়ে এখন নানান জায়গায় ঘুরিই বা কি করে, বা স্ত্রী পুত্রের সন্ধানেই বা যাই কেমন করে?

রাজা সুবিচার বললেন—বলুন ব্রাহ্মণ, আপনার এই বিপদে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

বৃদ্ধরূপী ভূদেব বলল—রাজা, আমি এই পুত্রবধূকে কোনও বিশ্বাসভাজন মানুষের কাছে রেখে যেতে চাই। তা আপনিই বলুন, রাজার চেয়ে বিশ্বাসভাজন মানুষ দেশে আর কে হোতে পারে? তাই আমার প্রার্থনা, আমি যতদিন ফিরে না আসি, ততদিন আমার এই পুত্রবধূকে আপনার কাছে রাখলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী ভূদেবের কথা শুনে রাজা বড় বিব্রত হলেন। ভাবলেন, কি বিপদ, পরের মেয়েকে ঘরে রাখাও যেমন বিপদের ব্যাপার, আবার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে চটানও ঠিক কাজ নয়। অনেক ভেবে রাজা স্থির করলেন, মেয়ে চন্দ্রপ্রভার কাছেই এই কিশোরী পুত্রবধূকে রেখে দেবেন।

এইসব ভেবে স্থির করে রাজা বললেন—ব্রাহ্মণ, আপনার ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। আপনার পুত্রবধূ এখানেই থাকবে।

রাজার কথামত ভূদেব পুত্রবধূরূপী মনস্বীকে রাজার কাছে রেখে, রাজাকে বারবার আশীর্বাদ করে চলে এল। রাজাও সংগে সংগে পুত্রবধূররূপী মনস্বীকে অন্তঃপুরে, রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভার কাছে পাঠিয়ে দিল।

দেখতেও সুন্দর, চন্দ্রপ্রভারও সমবয়সী তাই চন্দ্রপ্রভা আর পুত্র-বধূরূপী মনস্বীর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। চলা-ফেরা, শোওয়া-বসা, সবই এক সংগে করে দুইজনে। রাজকন্যা এক মুহূর্তও ছেড়ে থাকতে পারে না পুত্রবধূরূপী মনস্বীকে।

একদিন পুত্রবধূরূপী মনস্বী রাজকন্যাকে বলল—হ্যাঁ ভাই, সবসময়ে এত কি ভাব তুমি ? তোমাকে সবসময়েই কেমন দুঃখী দুঃখী লাগে, ব্যাপার কি ভাই ?

চন্দ্রপ্রভা ম্লানমুখে বলে—ভাই, তুমি আমার প্রাণের সাথী, তাই আমার দুঃখের কথা তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। একদিন বসন্তকালে, উপবনে বেড়াতে গিয়ে এক অপরূপ সুন্দর ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখতে পাই। তার কথা প্রতিদিন মনে উদয় হয়, তাকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সে থাকে কোথায়, কি নাম, কিছুই জানি না। অথচ এই কথা কাউকে বলতেও পারছি না। তুমি আমার প্রিয় সখী বলে সবকথা আজ বললাম।

রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভার কথায় পুত্রবধূরূপী মনস্বী মনে মনে ভারী খুশী। মনস্বী বলল—ভাই রাজকন্যা, আমি যদি সেই ব্রাহ্মণকুমারকে তোমার সামনে এনে দিতে পারি তাহলে কি পুরস্কার দেবে বল ?

রাজকন্যা বলল—যদি পার, তবে আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।

এই কথা শোনামাত্রই পুত্রবধূরূপী মনস্বী কামাখ্যা মন্ত্রবলে নিজের রূপে ফিরে এল।
রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভা এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে অবাক! অবাক বিস্ময়ে সুপুরুষ তরুণ মনস্বীর দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল—এতদিন এভাবে কিশোরী বধূ হয়ে ছিলে কি করে? আবার মুহূর্তে ব্রাহ্মণযুবকে রূপান্তরিতই বা হলে কি করে?
মনস্বী ধীরে ধীরে তখন যা যা ঘটেছিল সবই বলল। তার কামাখ্যা-মন্ত্রর কথাও জানাল। সবকথা শুনে রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভা বড় খুশী হোল।
এরপর মনস্বী গন্ধর্বমতে রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভাকে সেখানেই বিয়ে করল। মনস্বী রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভার সংগে অন্তঃপুরে রয়ে গেল। এভাবেই মনস্বী আর চন্দ্রপ্রভা সুখে দিন কাটাতে লাগল রাজ-প্রাসাদের ভিতরে। মনস্বী মেয়ের বেশেই রাজ অন্তঃপুরে থাকে বলে কেউই কিছু সন্দেহ করতে পারে না কিছু।
এমনি সময়ে একদিন অমাত্যভবনে রাজা সুবিচারের দুপুরের খাওয়ার নিমন্ত্রণ হোল। রাজা, রাজকন্যা ও ব্রাহ্মণপুত্রবধূরূপী মনস্বীকেও সংগে নিয়ে অমাত্যের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। অমাত্যর ছেলে ব্রাহ্মণবধূরূপী মনস্বীকে দেখে তার রূপে মোহিত হয়ে গেল।
রাজা, রাজকন্যা, মনস্বী সবাই রাজপ্রাসাদে ফিরে যাওয়ার পর মন্ত্রীপুত্র নিজের মনোবাসনা জানাল মন্ত্রীকে। বলল—বাবা, ব্রাহ্মণবধূকেই শুধু আমি বিয়ে করব। আর তা যদি না পার, তবে আমি আত্মহত্যাই করব।
অমাত্য ছেলেকে ভীষণ ভালবাসতেন। ছেলের এই আব্দার

যুক্তিযুক্ত নয় জেনেও রাজার কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাল—মহারাজ, দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণের দেখা নেই। তাই এই ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর সব দায়িত্বই আপনার। আপনি আমার ছেলের সংগে এই ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর আবার বিয়ে দিন।

অমাত্যর এই প্রস্তাবে রাজা তো ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। বললেন, —ছিঃ, ছিঃ, মন্ত্রী হয়ে একি অন্যায় প্রস্তাব করছ। ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করে তার পুত্রবধূকে আমার কাছে রেখে গেছেন, তাকে তোমার হাতে দিই কি করে?

মন্ত্রী বাড়িতে ফিরে পুত্রকে সবকিছুই বলল। মন্ত্রীপুত্র সবশুনে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে শয্যাশায়ী হোল। একমাত্র পুত্রের এই অবস্থা দেখে মন্ত্রীও খাওয়া-দাওয়া পরিত্যাগ করল।

মন্ত্রীর এই অবস্থা দেখে রাজ্যের অন্যান্য সভাসদগণ রাজাকে বলল—বৃদ্ধব্রাহ্মণ দীর্ঘকাল হোল বিদেশে গেছেন। তাঁর ফেরার লক্ষণ নেই। এদিকে মন্ত্রী খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছেন, রাজসভায়ও আসছেন না, এতে রাজ্যেরই ক্ষতি। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণ পুত্রবধূকে মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মতি জানাতে আপত্তি কোথায়? আপনিইবা কতকাল অন্যের পুত্রবধূর দায়িত্ব নেবেন?

সবার অনুরোধ, রাজা সুবিচারও অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুত্রবধূরূপী মনস্বীর কাছে মন্ত্রীপুত্রকে বিয়ের প্রস্তাব জানালেন।

রাজার অনুরোধের কথা শুনে পুত্রবধূরূপী মনস্বী বিষাদকণ্ঠে বলল—রাজার আদেশ সব সময়েই মানা উচিত। কিন্তু রাজা, আপনিই বলুন, অন্যের স্ত্রী হয়ে এই প্রস্তাব কি আমি মানতে পারি? এতো বড় অধর্মের কাজ হবে। রাজা এই উত্তর শুনে, মাথা নিচু করে ফিরে এলেন।

মনস্বী বুঝতে পারল ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠেছে। তাই সেইদিন রাত্রে, রাজকন্যা ঘুমালে, সবার অজান্তে গোপনদ্বার দিয়ে মনস্বী পালিয়েএল ভূদেবের বাড়ি। সমস্ত ঘটনাই ভূদেবকে জানাল। সবশুনে ভূদেব বলল এটা ভালই হয়েছে। এবার আমার যা করার আমি করব।

এদিকে সকালে উঠেই যখন পুত্রবধূরূপী মনস্বীকে রাজপ্রাসাদে পাওয়া গেল না, রাজা সুবিচার ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, আমি অন্যায় প্রস্তাব করতেই বুঝি বধূটি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মনে মনে বলে উঠলেন রাজা, সর্বনাশ, এখন যদি সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হন তখন কোথা থেকে দেব তাঁর পুত্রবধূকে ? মহামুশকিল, কি করি এখন ? চিন্তা ভাবনায় আকুল হয়ে ওঠেন রাজা সুবিচার।

ওদিকে ভূদেব কামাখ্যা মন্ত্রবলে তার বন্ধু শশীকে কুড়ি বছরের তরুণ ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত করল। তারপর রাজসভায় গিয়ে রাজা সুবিচারের সামনে গিয়ে উপস্থিত হোল।

বৃদ্ধরূপী ভূদেবকে দেখেইতো রাজা চমকে উঠলেন। ভীত রাজা ভূদেবকে বসবার জন্য আসন দিয়ে বলে উঠলেন—ব্রাহ্মণ আপনার ফিরতে এতদিন পার হয়ে গেল ?

বৃদ্ধরূপী ভূদেব বলল, মহারাজ কতরাজ্য খুঁজে তবেতো ছেলেকে পেলাম। এই দেখুন ছেলে। আনুন পুত্রবধূকে, ফেরত নিয়ে যাই। রাজা সুবিচার হাতজোড় করে বৃদ্ধরূপী ভুদেবকে সব কথা বললেন। বললেন—ব্রাহ্মণ, আমার অন্যায় প্রস্তাবেই আপনার পুত্রবধূ ভয়ে আমার প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেছে। আমায় ক্ষমা করুন। আমি এর জন্য যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ দেব।

বৃদ্ধরূপী ভূদেব বলল আমার পুত্রের ক্ষতিপূরণ হবে কি করে? এক যদি রাজকন্যার সংগে আমার পুত্রের বিয়ে দেন তবেই সব ঠিক হবে। নয়ত ব্রহ্মশাপ দিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি।

রাজা সুবিচার উপায় না দেখে রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভার সংগে পুত্ররূপী শশীর বিয়ে দিলেন। রাজকন্যাকে নিয়ে ভূদেব ও শশী ভূদেবের বাড়িতে চলে এল।

ভুদেব চন্দ্রপ্রভাকে নিয়ে বাড়িতে আসতেই শশী বলে, এ আমার স্ত্রী। আবার মনস্বী বলল, চন্দ্রপ্রভা আমারই স্ত্রী।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল প্রশ্ন করল—বলুনতো মহারাজ, শাস্ত্র আর নিয়মমতে রাজকন্যা কার স্ত্রী?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—মনস্বীর।

বেতাল প্রশ্ন করল—শাস্ত্রমতে মেয়েকে বিয়ে দেবার অধিকার বাবারই আছে। সবার সামনে শশীর সংগেই তো রাজকন্যার বিয়ে হয়েছে। তবুও মনস্বী কি করে তার আসল স্বামী হয়?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—পূর্বেই গান্ধর্বমতে মনস্বীর সংগে রাজকন্যার বিয়ে হয়। সেই স্বামী মনস্বী এখনও বেঁচে আছে। তাছাড়া এই বিয়ের কথা রাজা না জেনেই শশীর সংগে রাজকন্যার বিয়ে দেন, নেহাত নিরুপায় হয়ে। তাই সেই বিয়ে শাস্ত্রমতে সিদ্ধ নয়। রাজকন্যা যদি মনস্বীর স্ত্রীই হয়ে থাকে তবেই তা ন্যায় আর ধর্মের কাজ হবে।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধেফেলে আগের মতই যেতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার পঞ্চদশ গল্প ... ...

বেতালের পঞ্চদশ গল্প

বেতাল বলল—মহারাজ শুনুন তবে পঞ্চদশ গল্প..........

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বতের গায়ে পুষ্পনগর নামে এক খুব সুন্দর নগর ছিল। ঐ নগরে রাজত্ব করতেন রাজা জীমূতকেতু। পুত্রকামনা করে রাজা জীমূতকেতু কল্পবৃক্ষের পুজো করে, শেষে একটি পুত্র লাভ করেন। রাজা পুত্রের নাম রাখলেন জীমূতবাহন।

জীমূতবাহন ছিলেন ধীর স্থির ধার্মিক, দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ। অল্পকালের মধ্যেই রাজকুমার জীমূতবাহন সব শাস্ত্রেই পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। অস্ত্রবিদ্যায়ও নিপুণ হয়ে উঠলেন জীমূতবাহন। কিছুকাল পরে জীমূতকেতু কল্পবৃক্ষের পুজা করে বর প্রার্থনা করলেন—কল্পবৃক্ষ আমার প্রজাদের অর্থবান ধনবান করে দাও। কল্পবৃক্ষও রাজার প্রার্থনা পূরণ করলেন। পুষ্পপুরের মানুষেরা ধীরে ধীরে ধনী হয়ে উঠতে লাগল।

প্রজারা অর্থবান হয়ে যাওয়ায় তারা ভাবতে লাগল রাজা আবার কি ? আমাদের আর কি উপকার করতে পারে ? প্রজারা রাজাকে অবহেলা করতে শুরু করল।

ধর্মপ্রাণ রাজা জীমূতকেতু কিন্তু এতে বিচলিত না হয়ে দিনরাত ভগবানের চিন্তাতেই দিন কাটাতে লাগলেন। প্রজারা ভাবল এই সুযোগ। তারা বিদ্রোহী হয়ে রাজ্য আক্রমণ করল।

রাজকুমার জীমূতবাহন তখন রাজাকে বললেন—মহারাজ, আদেশ দিন, বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে সমুচিত শাস্তি দিই।

জীমূতকেতু উত্তর দিলেন—রাজকুমার মিথ্যে মারামারি কাটাকাটি করে লাভ কি ? জীবন-বিষয়-আশয় সবই তুচ্ছ। এর জন্য লড়াই না করে বরং চল, নির্জনে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করি, তাতেই সব মংগল হবে।

রাজকুমার জীমূতবাহন কি আর করেন। বাবার সংগে মলয় পর্বতে চলে গিয়ে, ছোট কুটির বানিয়ে সেখানেই দুজনে ভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন।

মলয় পর্বতের কাছেই ছিল এক অর্থবান বণিকের প্রাসাদ। সেই বণিকপুত্রের সংগে ভাগ্যক্রমে রাজকুমার জীমূতবাহনের আলাপ হয়ে গেল।

একদিন দুই বন্ধু, রাজকুমার আর বণিকপুত্র বেড়াতে বের হয়েছেন। কিছু দূরেই ছিল দেবী কাত্যায়নীর মন্দির। সেই মন্দির থেকে মিষ্টি বীণার ঝংকার ভেসে আসতেই দুই বন্ধুর ভীষণ কৌতূহল হল। দুজনেই মন্দিরে এসে দেখে ভারী মিষ্টি সুন্দরী এক মেয়ে, দেবী কাত্যায়নীর সামনে বসে নিবিষ্টমনে বীণা বাজিয়ে গান করে চলেছে। দুই বন্ধু

সেখানে বসে এক মনে সেই মিষ্টি গান শুনতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে, গান শেষ হলে, মেয়েটি বাইরে আসতে গিয়ে জীমূতবাহনকে দেখতে পেল। সুন্দর-সুঠাম রাজকুমার জীমূত-বাহনকে দেখে মেয়েটি তো তাকেই মনে মনে বর করবে ঠিক করে ফেলল। সাথীর সাহায্যে জীমূতবাহনের পরিচয় জোগাড় করে বাড়ি ফিরে এল মেয়েটি।

এই মেয়ে কিন্তু সাধারণ মেয়ে নয়। এ ছিল রাজা মলয়কেতুর মেয়ে। রাজকন্যা তার প্রিয় সখীকে দিয়ে রাজমাতার কাছে খবর পাঠাল বনবাসী রাজকুমার জীমূতবাহনকেই সে বিয়ে করবে। রাজমাতা খবর শুনে তৎক্ষণাৎ রাজা মলয়কেতু মেয়ের ইচ্ছের কথা জানাল।

মলয়কেতু তখন তার ছেলে, মিত্রাবসুকে বলল— রাজকুমার তোমার বোন রাজকুমারীর বিয়ের বয়স হোল। এখনতো বিয়ে দিতেই হয়। শুনতে পেলাম, রাজ্য ছেড়ে রাজা জীমূতকেতু মলয় পর্বতে পুত্র জীমূতবাহনকে নিয়ে বসবাস করছেন। তুমি রাজপুত্র জীমূত-বাহনের সংগে তোমার বোনের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাও।

রাজপুত্র মিত্রাবসু বাবার আজ্ঞামত বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হোল জীমূতকেতুর কাছে। এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন রাজা জীমূতকেতু। রাজকন্যার সংগে রাজকুমার জীমূতবাহনের বিয়ে হয়ে গেল। মহাসুখে দুজনে সেখানেই বাস করতে লাগলেন।

এভাবেই দিন চলেছে। এমনি সময়ে একদিন জীমূতবাহন ও মিত্রাবসু মলয় পর্বতে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেড়াতে বেড়াতে, পর্বতের উত্তরদিকে জীবূতবাহন দেখতে পেলেন এক সাদা

পদার্থের উঁচু ঢিপি। জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞেস করলেন—বন্ধু, ঐ রাশীকৃত স্তূপাকার জিনিস কি বলত?

মিত্রাবসু বলল—আগে এই মলয় পর্বতে সাপ আর গরুড়ে অহরহ যুদ্ধ লেগে থাকত। দীর্ঘদিন লড়াই-এর পর সাপেরা যুদ্ধে হেরে গিয়ে সন্ধি করল। সন্ধির শর্ত হোল এই সাপেরা প্রত্যেকদিন একটি করে সাপ গরুড়কে খেতে দেবে। এরপর প্রতিদিন দুপুরে একটি করে সাপ ঐ স্তূপটার কাছে এসে হাজির হোত। গরুড়ও সেই দুপুরে এসে সাপকে খেয়ে, তার হাড়গুলো ফেলে দিয়ে চলে যেত। এইভাবেই মৃত সাপের হাড় জমে জমে তৈরি হয়েছে ঐ সাদা হাড়ের স্তূপ।

এই কথা শুনে জীমূতবাহনের ভীষণ কষ্ট হোল। ভাবল, আহা রে, আজও বুঝি কোনও সাপের প্রাণ যাবে গরুড়ের হাতে। এই কথা ভেবে জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে বা পাঠিয়ে দিয়ে নিজে হাড়ের স্তূপের কাছে গিয়ে হাজির হল।

জীমূতবাহন সেখানে পেঁছে দেখে এক বৃদ্ধা নাগিনী খুব জোরে জোরে কাঁদছে। জীমূতবাহন বৃদ্ধা নাগিনীকে জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁগো মা, তুমি এভাবে কপাল চাপড়ে কাঁদছ কেন?

বৃদ্ধা নাগিনী সাপ-গরুড়ের যুদ্ধের কথা, শর্তের কথা সবই বলল। শেষে বলল—বাবা আজ যে একমাত্র ছেলে শংখচূড়ের এখানে বলি হবার পালি। শংখচূড় ছাড়া আমি বাঁচব কি করে সে ভেবেই কাঁদছি।

জীমূতবাহনের একথা শুনে ভীষণ কষ্ট হোল। বলল—মা তুমি আর কেঁদো না। আমি যে ভাবেই হোক প্রাণ দিয়েও তোমার ছেলে শংখচূড়কে বাঁচাব।

কথার মাঝখানেই শঙ্খচূড় এসে হাজির। জীমূতবাহন কে, কেন এসেছে, সবশুনে শংখচূড় বলল—রাজকুমার। আপনি সত্যিই দয়ালু, ধার্মিক। আপনার মত লোক পৃথিবীতে খুবই কম, তাই আপনারই বেঁচে থাকা দরকার। আমার মত সাপের মূল্য পৃথিবীতে কতটুকু? আমরা কতটুকুই বা পৃথিবীর উপকার করি? তাই আমার মত সামান্য সাপের জন্য আপনি জীবন দেবেন না।

রাজকুমার জীমূতবাহন বলল—তা হয় না শংখচূড়। ক্ষত্রিয় যা বলে, সেই প্রতিজ্ঞা রাখে। আমি ক্ষত্রিয় হয়ে যখন তোমাকে বাঁচাব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি তখন আমিই এখানে থাকব তুমি মার সংগে বাড়ি ফিরে যাও। এই বলে জীমূতবাহন গরুড়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

শংখচূড় কি আর করে। জীমূতবাহনের জেদের জন্য বৃদ্ধ নাগিনী মায়ের সঙ্গে ফিরে চলল। কিন্তু বাড়ি না গিয়ে কাত্যায়নী মন্দিরে গিয়ে শঙ্খচূড় রাজকুমার জীমূতবাহনের প্রাণ-রক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল।

এদিকে ঠিক সময়ে মলয় পাহাড়ের সেই জায়গায় গরুড় এসে হাজির। জীমূতবাহনকে সাপ ভেবে গরুড় তার তীক্ষ্ন ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে আকাশে উড়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। এইভাবে ঘুরপাক খেতে খেতে জীমূতবাহনের ডানহাতের রক্তমাখা কেয়ূর ছিটকে এসে পড়ল স্ত্রী রাজকন্যা মলয়বতীর সামনে।

জীমূতবাহনের নাম লেখা রক্তমাখা কেয়ূর দেখে মলয়বতী কাঁদতে লাগল। রাজা, মলয়বতী রাণী রাজপুত্র মিত্রাবসু সবাই রক্তমাখা কেয়ূর দেখে কাঁদতে শুরু করল। সবাই বুঝতে পারল জীমূত-

বাহনের কোনওভাবে মৃত্যু হয়েছে। জীমূতবাহনের খোঁজে সবাই ছুটল মলয়পর্বতে।
কাত্যায়নী মন্দিরে বসে শংখচূড় রাজবাড়ির কান্না শুনতে পেল। শঙ্খচূড় বুঝতে পারল গরুড়ের হাতে জীমূতবাহনের বিপদ ঘটেছে। শংখচূড় তখন ছুটে এল মলয় পর্বতে, পাহাড়ের স্তূপের কাছে। তারপর আকাশে চিৎকার করে চেঁচিয়ে বলল—পক্ষীরাজ গরুড় এই দেখ, আমিই সাপ শংখচূড়। তুমি ভুল করে রাজকুমার জীমূতবাহনকে ধরে নিয়ে গেছ খাবার জন্য। আজ তোমার আমাকেই খাবার কথা ছিল। তুমি রাজকুমারকে ছেড়ে না দিলে তুমিই অধর্মের ভাগী হবে।
শঙ্খচূড়ের কথা শুনে গরুড় তৎক্ষণাৎ জীমূতবাহনকে জিজ্ঞেস করল—কে তুমি? নিজের জীবন বিপন্ন করেছ কেন? তুমি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ।
জীমূতবাহন নিজের সমস্ত পরিচয় দিয়ে বলল—শংখচূড়কে বাঁচাতেই এ কাজ করেছি। জন্মালে যখন মরতেই হবে, তখন অন্যের প্রাণ বাঁচিয়ে মরাই তো ভাল।
জীমূতবাহনের কথায় গরুড় খুব খুশী হল। বলল—মহাপুরুষ রাজকুমার, বল তোমার জন্য কি করতে পারি?
জীমূতবাহন বলল—পক্ষিরাজ গরুড়, তুমি সত্যিই যদি আমার কোনও উপকার করতে চাও তবে বর দাও, এরপর সাপেদের আর এভাবে খাবে না। তোমার শর্ত থেকে তাদের মুক্তি দাও। যে সমস্ত সাপদের মেরেছ তাদেরও বাঁচিয়ে দাও।
গরুড় বলল—তথাস্তু! রাজকুমার, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। —এই বলে গরুড় পাতাল থেকে অমৃত এনে হাড়গুলোর ওপর

ছিটাতেই মৃত সাপেরা সবাই বেঁচে উঠল।

গরুড় তখন জীমূতবাহনকে বলল—রাজকুমার, তোমার মত দয়ালু লোক, আমার বরে রাজ্য ফিরে পাবে।

এই বলে পক্ষিরাজ গরুড় আকাশে উড়ে গেল।

সকলে জীমূতবাহনের এই অলৌকিক কাহিনী ক্রমেই জানতে পারল। জীমূতকেতুর শত্রুরা, জ্ঞাতিরা, প্রজারা সবাই ভয় পেয়ে গেল, ভাবল, জীমূতবাহন পক্ষিরাজের আশীর্বাদপূত, তাকে চটানো ঠিক নয়। তাই তারা সবাই এসে জীমূতবাহন, জীমূতকেতুকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাজ্য ফিরিয়ে দিল।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল প্রশ্ন করল—বলুন তো মহারাজ, শংখচূড় ও জীমূতবাহন এই দুজনের মধ্যে কার আত্মত্যাগ বেশি ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—শংখচূড়ের।

বেতাল আবার প্রশ্ন করল—রাজকুমার জীবন বিপন্ন করল, এমন আত্মত্যাগ করল, তবু কেন বলছেন শংখচূড়ের আত্মত্যাগ বেশি ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম প্রতিজ্ঞা পালন করা। রাজকুমার তাই করেছে। কিন্তু শংখচূড় ক্ষত্রিয় না হয়েও রাজকুমারের জীবন বাঁচিয়েছে প্রাণ তুচ্ছ করে। প্রথমে কোনওমতে রাজকুমারকে প্রাণত্যাগে যেতে দিতে চায় নি। তারপর উপায় না দেখে চলে গেলেও দেবী কাত্যায়নীর মন্দিরে রাজকুমারের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছে। সাপ হয়েও শংখচূড় রাজকুমারের চেয়েও মহৎ।

সঠিক উত্তর শুনে বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে শিরীষ গাছ থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধে ফেলে, আগের মতই যেতে লাগলেন।
বেতাল তখন শুরু করল তার ষষ্ঠদশ গল্প... ...

বেতালের ষষ্ঠদশ গল্প

বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে ষোড়শ গল্প।

চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে এক বণিক বাস করত। উন্মাদিনী নামে চন্দ্রশেখরের এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ছিল। মেয়ে বড় হল। চন্দ্রশেখর তখন রাজার কাছে গিয়ে বলল—মহারাজ, আমার এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আছে। আপনি যদি এই মেয়েকে বিয়ে করেন তবে খুশী হব। আর আপনার ইচ্ছে যদি না হয় তবে অন্য পাত্রের সংগে মেয়ের দেব। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জিনিসে রাজারই অধিকার, তাই আপনার কাছেই প্রথমে এসেছি।

মেয়ে সত্যিই সুন্দরী কিনা পরখ করার জন্য রাজা দুই-তিনজন সভাসদের সংগে মন্ত্রীকে পাঠালেন। উন্মাদিনী যদি সত্যিই সুন্দরী হয় রাজা তবে তাকে বিয়ে করবেন।

মন্ত্রীসহ সভাসদরা উন্মাদিনীর বাড়িতে গেলেন। দেখলেন,

উন্মাদিনী সত্যিই অতুলনীয়া সুন্দরী। ত্রিভুবনে এরকম মেয়ের দেখা পাওয়া ভার।

সভাসদের সংগে পরামর্শ করে মন্ত্রী ঠিক করলেন, এমন সুন্দরী মেয়েকে রাজা বিয়ে করলে রাজকার্যে রাজার মন থাকবে না। রাজা দিনরাত অন্তঃপুরেই থাকবেন। তার চেয়ে রাজাকে গিয়ে বলা ভাল মেয়ে কুরূপা আর কুলক্ষণা। ব্যস্, রাজা তাহলে মেয়েটিকে দেখবেনও না, বিয়েও করবেন না।

পরামর্শমত তারা রাজাকে সেরকম কথাই বলল। ফলে রাজা রত্নদত্ত বণিকের মেয়ে উন্মাদিনীকে বিয়ে করতে রাজী হলেন না। বণিক আর কি করে। খোজাখুঁজি করে, শেষে সেনাপতি বলভদ্রের সংগে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

এবার কিছুদিন পার হয়ে গেছে। রাজা একদিন নগর ভ্রমণ করতে করতে সেনাপতির বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলেন। ঠিক সেই সময়ে উন্মাদিনী সেজেগুজে ভাল গহনাগাটি পরে ছাদে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজার নজর উন্মাদিনীর দিকে। উন্মাদিনীর রূপ দেখে রাজা তো, মোহিত। তিনি তক্ষুনি রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। উন্মাদিনীর কথা ভেবে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

রাজাকে হঠাৎ এভাবে অন্যমনস্ক ভাবে রাজপ্রাসাদে ফিরতে দেখে রাজার একজন প্রিয় বন্ধু জিজ্ঞেস করল—মহারাজ, আজ হঠাৎ অন্যমনস্ক কেন? হঠাৎই বা ফিরলের কেন?

রাজা বললেন—দেখ বন্ধু সেনাপতির বাড়িতে যে মেয়েটিকে দেখে এলাম তার মত সুন্দরী এই পৃথিবীতে একটিও নেই। তার কথাই সবসময়ে মনে পড়েছে বলে আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি।

রাজবন্ধু বলল—মহারাজ, উনিও রত্নদত্ত বণিকের মেয়ে। আপনি বণিককন্যাকে বিয়ে না করায় সেনাপতি বলভদ্রর সংগে ওর বিয়ে হয়েছে।

রাজা বলেলন—ওঃ, বুঝেছি। মন্ত্রী ও সভাসদরা সঠিক খবর না দিয়ে আমাকে ঠকিয়েছেন।

রাজা এরপর মন্ত্রী আর সভাসদদের ডেকে বললেন—আপনারা সঠিক খবর না দিয়ে এভাবে আমাকে ঠকালেন কেন? আজ আমি বণিক কন্যাকে দেখেছি। তাঁর মত সুন্দরী এই পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ।

মন্ত্রী বললেন—রাজ্যের মংগলের জন্য এই কাজ করেছি। ঐ সুন্দরীকে বিয়ে করলে আপনি রাজকাজ না করে রাজঅন্তঃপুরেই থাকতেন। এতে দেশের অমংগল হোত। মহারাজ দেশের কথা ভেবে আপানাকে ঠকিয়েছি বলে আমাদের ক্ষমা করুন।

রাজা বললেন—আপানাদের বিবেচনা যুক্তিযুক্ত বলে আপনাদের ক্ষমা করলাম। আপনারা যান।

মন্ত্রী আর সভাসদরা চলে গেলে কি হবে, রাজার মনের দুঃখ মিটল না। মনের কষ্টে রাজা শুকিয়ে যেতে লগেলেন। শেষে দশদিনের মাথায় রাজা মারা গেলেন।

রাজার এভাবে মৃত্যু হওয়াতে সেনাপতি বলভদ্রের ভীষণ কষ্ট হোল। রাজার মনের কথাও জানতে পারল সেনাপতি। বলভদ্র ভাবল—ছিঃ, আমারই জন্য রাজার মৃত্যু হোল। বণিককন্যাকে যদি বিয়ে না করতাম তাহলে বণিককন্যার শোকে রাজা মারা যেতেন না। আমার এই রাজার মত ভাল রাজারও যখন এভাবে মৃত্যু হোল, তখন আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কি? এইভাবে

বলভদ্র শ্মশানে গেল। শ্মশানে গিয়ে চিতা প্রস্তুত করে সূর্য-দেবকে প্রণাম করে বলল—সূর্যদেব, এই প্রার্থনা তোমার কাছে, আবার যদি জন্মাই তবে আমার এই রাজাকেই যেন প্রভু হিসাবে পাই। বলভদ্র জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিল।
এইভাবে বলভদ্রের আত্মাহুতির কথা উন্মাদিনীর কানে পেঁছান মাত্রই উন্মাদিনী শ্মাশানে ছুটে এল, বলল—স্বামী ছাড়া আমারও বেঁচে থাকার মানে নেই। আমিও সহমরণে যাই। বলেই বলভদ্রের চিতায় আত্মাহুতি দিল।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল প্রশ্ন করল—বল তো মহারাজ, ঐ রাজা, বলভদ্র আর উন্মাদিনী এই তিনজনের মধ্যে কার মহত্ত্ব বেশি ?
রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন – রাজার।
বেতাল প্রশ্ন করল আবার—কেন ?
রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—রাজা যদি চাইতেন, ইচ্ছে করলেই উন্মাদিনীকে সেনাপতির বাড়ি থেকে নিয়ে এসে রাজপ্রাসাদে রাখতে পারতেন। কিন্তু ন্যায়ধর্ম মেনে ক্ষমতা থাকলেও তা তিনি করেন নি। আর প্রভুর জন্য ভৃত্য তো অহরহই প্রাণ দেয়, তাই বলভদ্রর আত্মত্যাগ খুব নতুন কিছু নয়। আর স্বামীর সংগে সহমরণে স্ত্রীদের যাওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই উন্মাদিনীর আত্মত্যাগও রাজার স্বেচ্ছামৃত্যুর চেয়ে বড় নয়। বিচারে রাজাই শ্রেষ্ঠ।
সঠিক উত্তর শুনে, বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে, শিরীষ

ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ ডাল থেকে বেতালকে নামিয়ে কাঁধে ফেলে, আগের মতই চলতে লাগলো।

বেতাল তখন শুরু করল তার সপ্তদশ গল্প...... ....

বেতালের সপ্তদশ গল্প

বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে সপ্তদশ গল্প........

হেমকুট নগরে বিষ্ণুশর্মা নামে একজন খুব ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করত। বিষ্ণুশর্মার ছেলের নাম ছিল গুণাকর। গুণাকর বড় বড় হল, কিন্তু ধার্মিক হল না, বরং পাশা খেলার নেশায় পেয়ে বসল। এই পাশার জুয়া খেলতে খেলতে গুণাকর বাবার প্রায় সব সম্পত্তিই নষ্ট করে ফেলল। তখন বিষ্ণুশর্মা বাধ্য হয়ে ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

গুণাকর তখন কি আর করে, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে এসে পেঁছাল নগরের শেষ-প্রান্তে এক নির্জন শ্মশানে। সেই নির্জন জায়গায় এক যোগী বসে যোগ সাধনা করছিলেন। গুণাকর যোগীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, তার সামনে চুপ করে বসে রইল।

যোগী গুণাকরের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন গুণাকর অভুক্ত, তার খিদে পেয়েছে। তিনি তাই জিজ্ঞেস করলেন গুণাকরকে—কিছু খাবে ?

গুণাকর বিনীত কণ্ঠে বলল—আপনার প্রসাদ পেলে তা নিশ্চয়ই খাব।

যোগী তখন মড়ার খুলিতে নানান অন্নব্যাঞ্জন ভর্তি করে গুণাকরকে খেতে দিলেন।

গুণাকর বলল—প্রভু, এই খাবার খেতে আমার ইচ্ছে ইচ্ছে না।

যোগী মুচকি হেসে যোগাসনে বসে চোখ বুজে মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করতেই এক যক্ষকন্যা উপস্থিত হল। যক্ষকন্যা হাতজোড় করে বলল—কি আদেশ প্রভু ?

যোগীবর বললেন-এই ব্রাহ্মণ আজ আমার অতিথি। ইনি বড়ই ক্ষুধার্ত। এর জন্য ভাল কিছু খাবার আন। যথাযোগ্য সমাদরের ব্যবস্থা কর।

যক্ষকন্যা মুহূর্তে সেই নির্জন শ্মশানে এক সুবিশাল প্রাসাদ তৈরি করে ফেলল। গুণাকরকে সেই প্রাসাদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সুগন্ধি চালের ভাত, নানান দামী দামী ব্যঞ্জন, মাছ-মাংস, দই-মিষ্টি খেতে দিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে যক্ষকন্যা তাকে সোনার পালংকে শুতে দিল, আর নিজে গুণাকরের পদসেবা করতে লাগল। পরিতৃপ্ত সহকারে খেয়েদেয়ে মহাসুখে গুণাকর ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখে, কোথায় প্রাসাদ, কোথায় যক্ষকন্যা, সে নির্জন শ্মশানে শুয়ে আছে।

গুণাকর তখন যোগীকে জিজ্ঞেস করল, এসব হোল কি করে ?

যোগীবর বললেন—এসবই সম্ভব হোল যোগবলে। যোগসাধনায়

যে সিদ্ধিলাভ করে, যক্ষকন্যা তার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকে চিরকাল। আর যক্ষকন্যা সবই দিতে পারে।

এসব কথা শুনে গুণাকরের ইচ্ছে হোল যোগসাধনা করবে। যোগীবরকে তার ইচ্ছার কথা জানাল। গুণাকরের ভীষণ আগ্রহ দেখে যোগীবর বলল—বেশ, এই যে মন্ত্রটি বলছি, এই মন্ত্র একগলা জলে দাঁড়িয়ে চল্লিশ দিন জপ কর। এই বলে মন্ত্রটি কানেকানে বলে দিল গুণাকরকে।

গুণাকর গুরু যোগীর উপদেশমত যোগসাধনা শুরু করল। চল্লিশ দিন পরে গুরুর কাছে এসে বলল—গুরুদেব, এখন কি আমার যোগসিদ্ধি হয়েছে? না এখন আরও কিছু করতে হবে?

যাগী বলল—নাঃ, তোমাকে আরও চল্লিশ দিন ঐ মন্ত্র জপ করতে হবে। তবে এবার আগুনে প্রবেশ করে মন্ত্র জপতে হবে।

যোগীর কথা শুনে গুণাকর বলল—গুরুদেব বহুদিন বাবা-মাকে দেখিনি। বহুদিন বাড়ি ছেড়ে এসেছি। তাই বাবা-মাকে দেখার জন্য মন বড় চঞ্চল হয়েছে। কয়েক দিনের জন্য বাড়ি ঘুরে আসি, তারপর যোগসাধনায় বসব।

যোগীগুরু গুণাকরকে বাড়িতে যাবার অনুমতি দিলেন। গুণাকর বাড়ি চলে গেল। বাবা-মা গুণাকরকে দেখে খুব খুশী হলেন। আনন্দে কেঁদে ফেললেন তাঁরা। বললেন—বাবা তোকে এতদিন না দেখে বড় মনকষ্টে ছিলাম। ভালই হোয়েছে, তুই ফিরে এসেছিস্।

গুণাকর বলল,—নাঃ, এবার আমি আবার ফিরেই যাব। তোমাদের বহুদিন না দেখে মন খারাপ লাগছিল, তাই দেখতে এসেছিলাম।

এবার আমি ফিরে যাচ্ছি যোগীগুরুর কাছে। সেখানেই যোগ-সাধনা করব।

বাবা-মা গুণাকরকে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না ঠিক করলেন। কিন্তু গুণাকর কোনও অনুরোধ শুনল না। বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যোগীগুরুর কাছে ফিরে এল। তারপর আগুনে প্রবেশ করে মন্ত্র জপ করতে শুরু করল চল্লিশ দিন ধরে। কিন্তু চল্লিশ দিন পরেও গুণাকর যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারল না।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল প্রশ্ন করল—বলতো মহারাজ, এত কৃচ্ছ্রসাধন সহ যোগসাধনা করেও কেন গুণাকর সিদ্ধিলাভ করতে পারল না?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—একাগ্রতাসহ সাধনা না করার জন্যই গুণাকর সিদ্ধিলাভ করে নি। প্রথমবারে চিন্তা ছিল বাবা মায়ের, পরের বারে চিন্তা ছিল কখন সিদ্ধিলাভ করে যক্ষকন্যা লাভ করি। ফলেই সাধনা বিফলে গেল।

সঠিক উত্তর শুনে, বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে, শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছের ডাল থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধে ফেলে, আগের মতই চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার অষ্টাদশ গল্প……

বেতালের অষ্টাদশ গল্প

বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে অষ্টাদশ গল্প·······

কুবলয়পুরে একজন খুব অর্থবান বণিক ছিলেন। তাঁর নাম ধনপতি। ধনপতি তার মেয়ে ধনবতীর বিয়ে দেয় গৌরীদত্তের সংগে।

বিয়ের কিছুকাল পরে ধনবতীর এক মেয়ে জন্মাল। গৌরীদত্ত মেয়ের নাম রাখলেন মোহিনী।

বেশ কিছুকাল পরে গৌরীদত্ত হঠাৎ মারা গেল। তারপরই গৌরীদত্তের আত্মীয়রা ধনবতীর সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে অত্যাচার শুরু করল। বেচারা ধনবতী আর কি করে? একদিন অন্ধকার রাতে, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, ছোট মেয়ে মোহিনীকে নিয়ে রওনা হল বাবার কাছে কুবলয়পুরে, ধনপতি বণিকের কাছে।

অন্ধকার রাত। ধনবতী আর তার মেয়ে মোহিনী পথ দিয়ে চলেছে। যেতে যেতে, পথ ভুল করে তারা এসে পড়ল এক শ্মশানে। সেই শ্মশানে একজন চোরকে চুরির অপরাধে কয়েকদিন আছে শূলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেচারা চোরের তখনও মৃত্যু হয় নি, বরং শূলে চড়ে শুধু যন্ত্রণাই পাচ্ছিল। এমনি সময়ে, অন্ধকারে চলতে চলতে, ধনবতীর ডান হাতটা হঠাৎ চোরের গায়ে লাগতেই চোর যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল—আঃ আঃ! কে তুই? এত যন্ত্রণার মধ্যে আবার খোঁচা দিয়ে কষ্ট দিচ্ছিস আমায়?

চোরের কথায় ধনবতীর চমক ভাঙ্গে। ব্যাপারটা বুঝতে পারে সে। ধনবতী চোরকে বলে—বাপু অন্ধকারে দেখতে পাই নি। তাই ধাক্কা লেগে গেছে। না জেনে এই দোষটা করে করেছি বলে ক্ষমা করো।

এরপর ধনবতী চোরকে জিজ্ঞেস করল—তুমি কে? তোমাকে এভাবে শূলেই বা চড়ানো হোল কেন?

চোর উত্তর দিল—আমি বণিক মানুষ। চুরির দায়ে আমাকে শূলে দেওয়া হয়েছে তিন দিন আগে। কিন্তু শূলে চড়েও মৃত্যু না হওয়ায় এই অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি। এর একটা কারণও আছে।

ধনবতী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—কি কারণ?

চোর বলল—গণকরা ছোটবেলাতেই বলেছিল, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমি মরব না। আমার আজও বিয়ে হয়নি, তাই আমি মরছি না। তাই তুমি যদি তোমার মেয়ের সংগে বিয়ে দাও, তবে আমি মরতে পারব, আমার এই কষ্টেরও শেষ হবে। তার বদলে আমার সব টাকা পয়সা তোমাকে দিয়ে যাব। আমার অনেক টাকা পয়সা আছে, আমি তা এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে

রেখেছি। সে-সবই তোমাদের হয়ে যাবে। যদি বিয়েতে রাজী হও।

ধনবতী চোরের কথায় লোভী হয়ে উঠল। মৃত্যুমুখী চোরের সংগেই মেয়ে মোহিনীর বিয়ে দিতে মনে মনে রাজী হোল। কিন্তু ভেবে চিন্তে একথা বলল—দেখ, এই বিয়ে দিতে আমার অমত নেই। কিন্তু দেখ, আমার যে বড় ইচ্ছা দৌহিত্রের মুখ দেখে তবে যেন মরি। তোমার সঙ্গে মোহিনীর বিয়ে হলে মোহিনীর তো আর ছেলে হবে না, তখন দোহিত্রের মুখ দেখব কি করে?

চোর বলল—এ এমন কি কঠিন কথা। মোহিনীর সংগে আমার বিয়ে দাও। আমি যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাই। আমি অনুমতি দিচ্ছি মোহিনীর বিয়ে দিও। তাহলেই তোমার সাধ পূর্ণ হবে।

ধনবতী চোরের সংগে ছোট মেয়ে মোহিনীর বিয়ে দিল। চোর তখন বলল—ঐ যে দূরে গাঁ দেখছ তারই পশ্চিম সীমানায় আমার বাড়ি। আমার বাড়ীতে, পূর্বদিকে যে কুয়ো আছে তারই প্রায় গা ঘেঁসে আছে এক বটগাছ। সেই বটগাছের গোড়ায় পোঁতা আছে প্রচুর টাকাপয়সা, সোনাদানা। কথা বলতে বলতেই চোর মারা গেল।

ধনবতী চোরের নির্দেশমত জায়গায় গিয়ে বটগাছের গোড়া খুঁড়ে, অনেক মোহর, সোনাদানা, মণিমুক্তা পেল। সেসব নিয়ে ধনবতী রওনা হোল কুবলয়পুরে, বাবার কাছে। সংগে রইল ছোট্ট বিবাহিতা মেয়ে মোহিনী।

ধনবতী কুবলয়পুরে বাবার কাছেই থাকে। চোরের সম্পত্তি পেয়ে এখন আর ধনবতীর কোনও কষ্ট নেই। এদিকে ছোট্ট মোহিনীও

ধীরে ধীরে বড় হোল। দেখতেও সুন্দরী হয়ে উঠল। ধনবতী তখন বহু খুঁজে-পেতে টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে এক পাত্রের সংগে মোহিনীর বিয়ে দিল। কিন্তু এই বিয়ের কয়েকমাস পরেই সেই বর ধনবতীর এইসব টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে গেল।

এরই কিছুদিন পরে মোহিনীর এক সুন্দর ছেলে জন্মাল। ষষ্ঠীর দিন রাতে মোহিনী স্বপ্ন দেখল, দেখতে এক অদ্ভুত পুরুষ তার সামনে এসে দাঁড়াল। পুরুষটির দুটো হাত, কিন্তু পাঁচটা মাথা। প্রত্যেক মাথায় তিনটে-চোখ আর একটা করে অর্ধচন্দ্র। পিঠে ঝুলছে তার লম্বা জটা। ডান হাতে ত্রিশূল, গলায় সাপের মালা, পরনে বাঘছাল, ধবধবে সাদা গায়ের রঙ। গায়ে ঝুলছে সাপের পৈতে। ভস্ম মাখা গা।

এই অপরূপ মানুষ মোহিনীকে বলল—বাছা, তোমার যে ছেলে হয়েছে সে ক্ষণজন্মা। সে বড় হলে পৃথিবীর অধিশ্বর হবে। তাই আমার আদেশ, ঐ ক্ষণজন্মা ছেলেকে, এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার সংগে, এক ঝুড়িতে বসিয়ে, মাঝরাতে রাজবাড়ির সিংহদরজার সামনে রেখে এস। দেখবে রাজা তোমার এই ছেলেকে রাজপুত্রের আদরেই মানুষ করবে। কথার সংগে সংগেই অপরূপ মানুষ শূন্যে মিলিয়ে গেল। মোহিনীরও স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

মোহিনী মাকে স্বপ্নের কথা বলল। সব শুনে ধনবতী খুব খুশী হল। স্বপ্নের আদেশমত, ঝুড়িতে মোহিনীর ছেলেকে বসিয়ে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পেটিতে ভরে, মাঝরাতে, রাজবাড়ির সিংহ-দরজা রেখে এল।

এদিকে রাজাও ঠিক এরকমই স্বপ্ন দেখলেন। সেই অদ্ভুত

চেহারার পুরুষ, রাজার সামনে এসে বলছে—মহারাজ ওঠ, ওঠ। দেখ, তোমার সিংহদরজায় এক সুলক্ষণযুক্ত ছেলে, ঝুড়ির মধ্যে শুয়ে আছে। যাও নিয়ে এস তাকে, ছেলের মত মানুষ কর। ঐ ছেলেই তোমার যোগ্য উত্তরাধিকারী হবে।

স্বপ্ন দেখে রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তৎক্ষণাৎ রাণীকে জাগিয়ে বললেন, এই স্বপ্নের কথা। তারপর রাজা-রাণী দু-জনেই সিংহ-দরজায় গিয়ে হাজির হলেন। দেখেন, সত্যিই ঝুড়ির মধ্যে শুয়ে ছোট ভারী সুন্দর এক ছেলে। রাণী কচি শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। রাজা এই ছেলের নাম রাখলেন হরদত্ত।

এরপর সময় পার হয়ে যায়। বছর পার হয়। হরদত্ত বড় হোতে লাগল। লেখাপড়ায় যেমন হয়ে পণ্ডিত উঠল, যুদ্ধবিদ্যাতেও তেমনি পারদর্শী হল হরদত্ত। শেষে, একসময় রাজা মারা গেলেন। হরদত্ত রাজা হয়ে বসে ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবী জয় করে পৃথিবীর অধীশ্বর হল।

কিছুকাল পরে হরদত্ত তীর্থযাত্রায় রওনা হয়ে উপস্থিত হল গয়ায়। ফল্গু নদীর তীরে শ্রাদ্ধ করে হরদত্ত যখন পিণ্ড দিতে গেলেন, এখন নদীর মধ্যে থেকে তিনটে মানুষের হাত উঠে এল। এই তিনজনের হাতের মধ্যে প্রথম জনের হাত হল সৎ-পিতার চোরের দ্বিতীয় জনের হাত হল হরদত্ত জনক পিতার, আর তৃতীয় হাত হোল পালক রাজার।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল প্রশ্ন করল,—বলতো মহারাজ ঐ তিনজনের মধ্যে হরদত্তর পিণ্ড-অধিকারী কে?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—চোর।

বেতাল আবার প্রশ্ন করল—হরদত্তের বাবা নয় কেন ? রাজা নয় কেন ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—রাজা হরদত্তকে পালন করেছিলেন যার জন্য সহস্র মুদ্রা পেয়েছিলেন, আর রাজার দত্তক নেবার সুযোগও হয় নি। আর হরদত্তর মা মোহিনী দ্বিতীয়বার যাকে বিয়ে করে, সেই বিয়ে হয় অর্থের লোভে, তাই হরদত্তর বাবা টাকা পয়সা চুরি করে, পালিয়েই যায় হরদত্তকে প্রতিপালন করে নি। চোরই বিয়ে করার পর প্রতিপালনের উপযোগী প্রচুর অর্থ দিয়ে গিয়ে যথার্থ পিতার কাজ করেছে। সেজন্যই চোর পিন্ড পাবার অধিকারী।

সঠিক উত্তর শুনে, বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে শিরীষ গাছের ডাল থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধে ফেলে, আগের মতই চলতে লাগল।

বেতাল তখন শুরু করল তার উনবিংশ গল্প.........................

বেতালের ঊনবিংশ গল্প
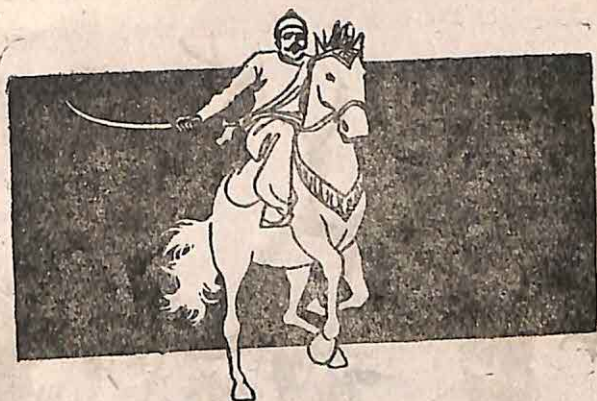
বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে উনবিংশ গল্প—

রূপদত্ত নামে এক রাজা বাস করতেন চিত্রকূট শহরে। রাজা রূপ-দত্ত একদিন শিকার করতে বেরিয়েছেন। ঘোড়ায় চড়ে, হরিণের পিছনে পিছনে ছুটে জংগলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে শ্রান্ত হয়ে পড়লেন রাজা। শ্রান্ত রাজা শেষে এসে পৌঁছালেন এক ঋষির আশ্রমের আসনে।

আশ্রমের সামনেই ছিল এক সুন্দর পুষ্করিণী। রাজা রূপদত্ত তাঁর শ্রান্ত ঘোড়াকে পুষ্করিণীর সামনের গাছের ডালে বেঁধে, গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন বিশ্রামের জন্য।

অল্প কিছুক্ষণ পরে এক অপরূপ সুন্দরী ঋষিকন্যা সেই পুষ্করিণীতে স্নান করতে এলেন। রাজা তো অপরূপা সুন্দরী ঋষিকন্যাকে দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। ঠিক করলেন, এই এই ঋষিকন্যাকে বিয়ে করবেন।

রাজাকে গাছের তলায় বসে থাকতে দেখেও ঋষিকন্যা কোনও কথা বলল না। পুষ্করিণীতে স্নান করতে চলে গেলেন। স্নান সেরে

রাজা তো সুন্দরী ঋষিকন্যাকে দেখে মোহিত হয়ে গেলেন

ঋষিকন্যা আশ্রমের দিকে যেতে শুরু করল। তখন রাজা রূপদত্ত ঋষিকন্যাকে বললেন—ঋষিকন্যা, আমি মৃগয়ায় এসে রোদে পুড়ে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এখানে বসে আছি। অথচ তুমি একবারও আমার সংগে কোনও কথা বললে না। এটা কি ঋষিকন্যার কাজ হোল ?

রাজার কথায় ঋষিকন্যা ঘুরে তাকাল রাজার দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঋষি বন থেকে ফুল-ফল জোগাড় করে সেইখানে এসে দাঁড়ালেন।

ঋষিকে দেখে রাজা রূপদত্ত তাঁকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন—আমি চিত্রকূটের রাজা রূপদত্ত।

রাজার পরিচয় পেয়ে ঋষি বললেন—বৎস, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

ঋষির আশীর্বাদ পেয়ে রাজা রূপদত্তের সাহস বেড়ে গেল। ঋষিকে বললেন—প্রভু, ঋষির আশীর্বাদ কক্ষনো মিথ্যে হয় না। কিন্তু প্রভু, মনে হচ্ছে আশীর্বাদ থাকলেও আমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে না।

ঋষি বললেন—ঋষির আশীর্বাদ কখনো মিথ্যে হয় না। বল বৎস, তোমার ইচ্ছে কি ?

রাজা রূপদত্ত বললেন–প্রভু, আমি ঋষিকন্যাকে বিয়ে করতে চাই। আপনার সম্মতি পেলেই তা সম্ভব হয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঋষিকে মত দিতে হল কারণ আগেই তিনি রাজাকে আশীর্বাদ করেছেন, তাই।

রাজা তখন ঋষিকন্যাকে বিয়ে করে রাজধানীতে ফিরতে শুরু করলেন। পথে রাত হলে, রাজা-রাণী ফলমূল খেয়ে গাছতলায় রাত কাটালেন।

মাঝরাতে, যখন রাজারাণী ঘুমাচ্ছেন, তখন এক রাক্ষস এসে জাগিয়ে বলল—বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, তাই রাণীকেই খাব। তুমি রাজা, তোমাকে খেলে রাজ্যের ক্ষতি হবে। তাই রাণীকেই খাচ্ছি। রাজা রাক্ষসকে বললেন, নাঃ, নাঃ, রাণীকে খেও না। বরং তার বদলে যা চাও তাই পাবে।

রাক্ষস বলল—বেশ, রাণীকে খাব না, যদি তার বদলে একটি বার বছরের ব্রাহ্মণপুত্রের মাথা কেটে আমার হাতে দাও।

রাজা বললেন—আচ্ছা, তাই পাবে। আজ থেকে সাতদিন পরে রাজধানীতে এস, বার বছরের ব্রাহ্মণপুত্রের মাথা কেটে তোমাকে দেব। রাক্ষস তখন রাজারাণীকে ছেড়ে দিল।

রাজা এরকম প্রতিজ্ঞা করে, নতুন রাণীকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। কিন্তু ফিরে এলে কি হবে, সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকেন রাজা, কিভাবে কোথা থেকে বার বছরের ব্রাহ্মণের ছেলে পাবেন তিনি?

রাজাকে সবসময়ে চিন্তিত থাকতে দেখে মন্ত্রী বললেন—মহারাজ এত দুশ্চিন্তা করছেন কেন?

রাজা মন্ত্রীকে সব কথাই খুলে বললেন। সবশুনে মন্ত্রী বললেন—ঠিক আছে এজন্য কিছু ভাববেন না। সব ঠিক করে দেব।

মন্ত্রীর কথায় রাজার দুশ্চিন্তা কমে গেল। এদিকে মন্ত্রী করল কি, মানুষের মাপের একটা সোনার মূর্তি তৈরি করে শহরের চৌমাথায় রেখে দিল—যে ব্রাহ্মণ তার বার বছরের ছেলেকে বলি দেবার জন্য রাজাকে দান করবেন, তিনিই এই সোনার মূর্তিটা পাবেন।

এদিকে এক গরীব ব্রাহ্মণের বার বছরের ছেলে ছিল। মন্ত্রীর

ঘোষণা শুনে সেই গরীব ব্রাহ্মণ ভাবল—গরীব হয়ে এভাবে আর বাঁচা যায় না। এজীবনে টাকা-পয়সার মুখই দেখতে পেলাম না। এই দেখছি সুযোগ। ছেলেকে রাজাকে দিয়ে, সোনার প্রতিমা নিয়ে এলে অর্থের অভাব ঘুচে যাবে।

ব্রাহ্মণ তবুও একবার ব্রাহ্মণীর মতটা জানতে চাইল। ব্রাহ্মণীও প্রস্তাবে রাজী হল। তখন ব্রাহ্মণ তার বার বছরের ছেলেকে রাজার হাতে দিয়ে, সোনার মূর্তি নিয়ে খুশীমনে বাড়ি ফিরে এল।

এরপর ঠিক সাতদিনের দিন রাক্ষস এসে হাজির। বার বছরের ব্রাহ্মণপুত্রকে নিয়ে আসা হোল বলিদানের জন্য। রাজা খড়্গ তুললেন বলিদানের জন্য।

ছেলেটা বলির ঠিক আগে এক ঝলক হাসল। তারপর শান্তভাবে মাথা নিচু করল। রাজাও বলিদান শেষ করলেন।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল প্রশ্ন করল,—বলতো মহারাজ মরবার আগে ছেলেটা না কেঁদে হাসল কেন?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—ছেলেটা এই ভেবে হাসল, বাবা-মা মা ছেলেকে প্রতিপালন করে, শত দুঃখেও বিপদ থেকে বাঁচায়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেই বাবা-মা অর্থের লোভে, রাজার কাছে আমায় বিক্রী করে দিল। আবার রাজাই দেশের প্রজাদের আপদ বিপদ থেকে বাঁচায়। আমার ক্ষেত্রে, সেই রাজাই নিজের সুখের জন্য আমার মত ছোট প্রজার প্রাণ নিতেও দ্বিধা করলেন না। রক্ষকই ভক্ষক হলেন। এই দুই কথা ভেবেই, দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠল ছেলেটা।

সঠিক উত্তর শুনে, বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে, শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছের ডাল থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধে ফেলে, আগের মতই চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার বিংশতিতম গল্প………………

বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে বিংশতি গল্প………

অর্থদত্ত নামে এক ধনবান বণিক বাস করত বিশালপুর নগরে। অর্থদণ্ড তার একমাত্র মেয়ে অনঙ্গমঞ্জরীর বিয়ে দিল কমলপুর শহরের বণিক মদনদাসের সংগে। বিয়ের মাত্র কিছুদিন পরেই মদনদাস ব্যবসায়ের কাজে বহুদিনের জন্য বিদেশে গেল। অনঙ্গমঞ্জরী শ্বশুরবাড়িতেই থাকে।

কিছুদিন এরপর কেটে গেল। একদিন অনঙ্গমঞ্জরী কাজকর্ম শেষ করে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। এমনি সময়ে কমলাকর নামে সুদর্শন ব্রাহ্মণ যুবা, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সুন্দরী অনঙ্গমঞ্জরীকে দেখে থমকে দাঁড়াল। অনঙ্গমঞ্জরীরও নজর পড়ল সুপুরুষ ব্রাহ্মণযুবার দিকে। দুজনেই অবাক চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকল। কেউ কিন্তু কারুর সংগে কথা

বলল না। শেষে ব্রাহ্মণযুবা বাড়ি ফিরে গেল, অনঙ্গমঞ্জরীও ঘরের ভিতরে চলে গেল।

এদিকে বাড়ি ফিরে গেলে কি হবে, ব্রাহ্মণযুবা কিছুতেই অনঙ্গমঞ্জরীকে ভুলতে পারল না। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে বিছানায় পড়ে রইল। প্রিয়বন্ধু জিজ্ঞাসা করল—হঠাৎ এরকম আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে কেন? কমলাকর কোনও উত্তর না দিয়ে আগের মতই আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বিছানায় পড়ে রইল।

ওদিকে কমলাকর জানলার সামনে থেকে অন্য দিকে চলে যেতেই অনঙ্গমঞ্জরীও ঘরের মধ্যে বিছানায় পড়ে কাঁদতে লাগল। ব্রাহ্মণ যুবার কথা ভেবেই অনঙ্গমঞ্জরীর মন খারাপ হয়ে গেল।

অনঙ্গমঞ্জরীর প্রিয় সখী হঠাৎ অনঙ্গমঞ্জরীকে এভাবে কাঁদতে দেখে অবাক হয়ে গেল। শেষে বলল—কি ভাই, এভাবে কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?

সখীর কাছে কোন কথাই গোপন করত না অনঙ্গমঞ্জরী। তাই সব কথাই বলল। এও বলল—ব্রাহ্মণযুবাকে না দেখতে পেলে আমি প্রাণত্যাগ করব।

সখী বলল—বণিক মদনদাস বিদেশে। এই অবস্থায় অপরিচিত মানুষের সংগে দেখাসাক্ষাত করা ভাল দেখায় না। লোকে এজন্য নিন্দা করবে যে! বদনাম দেবে।

অনঙ্গমঞ্জরী কোন উপদেশই কানে নিল না। শুধু বলল—ব্রাহ্মণ-যুবাকে না পেলে সে আত্মহত্যাই করবে। এই বলে অনঙ্গমঞ্জরী খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করল।

সখী কি আর করে? শেষে খবর নিয়ে ব্রাহ্মণযুবা কমলাকরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। সখীর মুখে অনঙ্গমঞ্জরীর ইচ্ছা

জানতে পেরে আনন্দে, সেই মুহূর্তেই অনঙ্গমঞ্জরীর সংগে দেখা করার জন্য মদনদাসের বাড়ির দিকে রওনা হোল।
কিন্তু দুর্ভাগ্য কমলাকরের। মদনদাসের বাড়িতে পেঁাছে দেখে, অনঙ্গমঞ্জরী তার দেখা না পেয়ে, হৃদকষ্টে মারা গেছে। এই দেখে অনঙ্গমঞ্জরীর শোকে, ব্রাহ্মণ কমলাকরও সেই মুহূর্তে হৃদরোগে মারা গেল।
অনঙ্গমঞ্জরী আর কমলাকরের বাড়ির লোকেরা কি আর করে? দুজনের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে, একই চিতায় শুইয়ে চিতা জ্বালিয়ে দিল।
ইতিমধ্যে অনঙ্গমঞ্জরীর স্বামী, বণিক, মদনদাস, ব্যবসা সেরে সেই পথ দিয়েই আসছিল। পথে, এই ব্যাপার শুনতে পেয়ে চিতার সামনে ছুটে গেল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল—হায় অনঙ্গমঞ্জরী! বলেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দিল।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল প্রশ্ন করল—বলতো মহারাজ, অনঙ্গমঞ্জরী, কমলাকর আর মদনদাস, এই তিনজনের মধ্যে কার ভালবাসা বেশি?
রাজা বিক্রমাদিত্য বলেন—মদনদাসের।
বেতাল আবার প্রশ্ন করে—কেন?
রাজা বিক্রমাদিত্য উত্তর দেন—অনঙ্গমঞ্জরী আর কমলাকর দুজনে দুজনকে হঠাৎ ভালবাসে, তাই তাদের এই ভালবাসা ক্ষণিকের। কিন্তু মদনদাস স্ত্রীকে সত্যিই খুব ভালবাসত। তাই স্ত্রীর অন্যায় কাজ শুনেও, তার শোকে বিহ্বল হয়ে আত্মাহুতি দিল। স্ত্রীর ওপরে এই অগাধ ভালবাসা চিরকালের, আর তাই অমূল্য।

সঠিক উত্তর শুনে, বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে, শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছের ডাল থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধে ফেলে, আগের মতই চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার একবিংশ গল্প… …

বেতালের একবিংশ গল্প
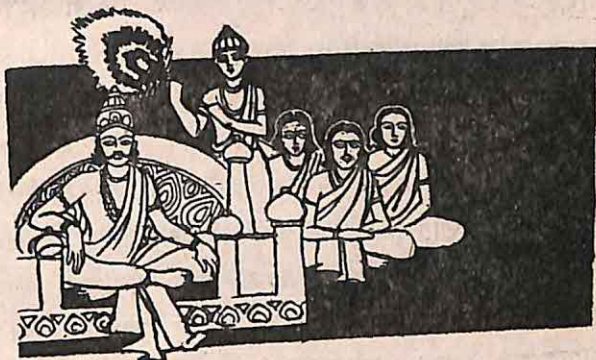
বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে একবিংশ গল্প ·····

জয়স্থল নগরে, বিষ্ণুশর্মা নামে একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর ছিল চারজন ছেলে, কিন্তু ছেলেরা কেউ ভাল ছিল না। বড় ছেলে দিনরাত পাশা খেলে দিন কাটাত। মেজ ছেলে ছিল চরিত্রহীন। সেজ ছেলে নিলজ্জ বদমাস আর পাজী। এককথায় লম্পট। আর ছোট ছেলে দেবদ্বিজে বিশ্বাস করত না, ছিল একদম নাস্তিক।

একদিন বিষ্ণুশর্মা চার ছেলেকে ডেকে বললেন—দেখ বাপু, যে দিনরাত এভাবে পাশা-দাবা খেলে, লক্ষ্মী তার প্রতি সদয় হন না। তার চিরকালই অর্থকষ্ট থাকে। যে এভাবে পাশা-দাবা খেলে, তার হিতাহিতবুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি, ধর্মজ্ঞান সব নষ্ট হয়ে যায়। দেখ নি যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মপ্রাণ রাজাও পাশায় হেরে,

রাজ্য হারিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন। যে মানুষ দুশ্চরিত্র-লম্পট হয়, সে সব সময়ই দুঃখী হয়ে থাকে। দুশ্চরিত্র মানুষরা তার খারাপ স্বভাবের জন্য শেষে সমস্ত টাকা পয়সা নষ্ট করে ফেলে, আর শেষকালে চুরি-ডাকাতি করে নরকে যায়। যে লজ্জাহীন, সে কোনও ভাল কথা শোনেও না, ভাল কাজ করেও না। লোকে কি বলবে, না বলবে, এসব সে ভাবেও না। ফলে খুশীমত আজেবাজে কাজ করে শেষে দ্রুত মারা যায়। এসব লোক যত তাড়াতাড়ি মরে, অন্য লোকেরা তত খুশী হয়। আর দেবদ্বিজে যার ভক্তি নেই, তার গুরুজনেরও শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে না। ফলে সেসব মানুষের সঙ্গে অন্যেরা কথা বলতে ঘৃণাবোধ করে। ভেবে দেখ এরপর তোমরা তোমাদের স্বভাব বদলাবে কিনা? তোমাদের মত এরকম চারছেলে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।

বিষ্ণুশর্মা এভাবে চার ছেলেকে বকাঝকা করায় চার ছেলের মনে অনুশোচনা এল। তখন চার ভাই পরামর্শ করে ঠিক করল— ছোটবেলায় লেখাপড়া না করেই আমরা চারজনে এত খারাপ হয়ে গেছি। বাবা যা বলেছেন তা ধ্রুব সত্যি। তাই আর সময় নষ্ট না করে, বিদেশে গিয়ে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে আসি। এই আলোচনা করে, চারভাই চারদিকে চলে গেল। নানান্ দেশ ঘুরে ঘুরে বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুকাল পর, বিদ্যাশিক্ষা শেষ হলে, চারভাই আবার দেশের দিকে ফিরতে লাগল। পথে চারজনের দেখা হল। চারভাই তখন একসংগে, খুশীমনে, দেশের দিকে চলতে লাগল। চলতে, চলতে, চলতে, তারা দেখল, একজন মুচী একটি মরা

বাঘের মাংস ও চামড়া নিয়ে চলে গেল। শুধু চারদিকে পড়ে থাকল বাঘের হাড়গুলো।

তখন চার ভাই-এর এক ভাই নতুন শেখা মন্ত্রে বাঘের হাড়গুলো, জোড়া লাগিয়ে দিল। অন্য ভাই মাংস লাগাবার মন্ত্র শিখেছিল। সে মন্ত্রবলে বাঘের গায়ে মাংস লাগিয়ে দিল। আর একভাই চামড়া লাগাবার মন্ত্র শিখে এসেছিল। সে মন্ত্রবলে বাঘের গায়ে চামড়া চোখ মুখ সব বসিয়ে দিল। এদিকে চতুর্থ ভাই শিখেছিল সঞ্জীবনী বিদ্যা, যার বলে, মরাকে বাঁচানো যায়। এবার চতুর্থ ভাই সঞ্জীবনী বিদ্যায় বাঘকে বাঁচিয়ে তুলল।

বাঘ বেঁচে উঠেই চেঁচিয়ে উঠল—হালুম। আর তারপর চার ভাইকে নিমেষে খেয়ে ফেলল।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল প্রশ্ন করল—বলতো মহারাজ চার ভাই-এর মধ্যে সবচেয়ে বোকা কে ?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—চতুর্থ ভাই যে বাঘকে বাঁচিয়ে তুলে সবার জীবননাশের কারণ হোল।

সঠিক উত্তর শুনে, বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে ফিরে গিয়ে শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছের ডাল থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধে ফেলে আগের মতই চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার দ্বাবিংশ গল্প ....

বেতালের দ্বাবিংশ গল্প
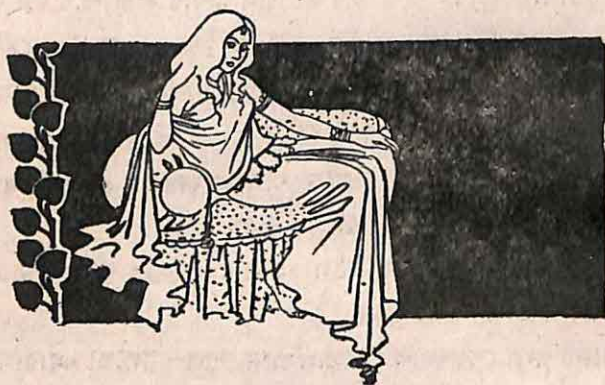
বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে দ্বাবিংশ গল্প……

বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ বলে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। নারায়ণ একদিন ভাবলেন—বয়স হয়েছে, বুড়ো হয়েছি, ভাল করে চলা-ফেরার ক্ষমতাও নেই। কদিনই বা আর বাঁচব? কিন্তু এক্ষুনি আমার মরতে ইচ্ছে করছে না। যদি আবার যুবক হয়ে যাই তবে এই পৃথিবীর সুখ আরও কিছুকাল ভোগ করতে পারি। এই কথা চিন্তা করে বৃদ্ধ নারায়ণ ভাবলেন, তাইতো, আমি একদেহ থেকে অন্য দেহে প্রবেশ করার মন্ত্র জানি। তাহলে কোনও একজন যুবকের দেহে প্রবেশ করলেই তো আমার আশা মিটে যায়।

এই ভেবে বৃদ্ধ নারায়ণ তার ছেলে, বৌ নাতি-নাতনী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, সবাইকে ডাকলেন। মিথ্যে করে বললেন—দেখ আমি বুড়ো হয়েছি। তাই এই সংসারে থাকতে আর মন চাইছে না।

আমি তাই ভগবানের আরাধনা করার জন্য বনে গিয়ে তপস্যা করব, তোমরা আমাকে বিদায় দাও।
সকলে বুড়োর কথা বিশ্বাস করল। আর বুড়ো নারায়ণ তখন বাড়ি ছেড়ে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অন্যদেশের দিকে চলে গেলেন।
বুড়োকে ছেড়ে দিতে বাড়ির সবার কষ্ট হল। বুড়ো কিন্তু কোন দিকেই নজর দিলেন না।
যেতে যেতে, বুড়ো এক যুবকের দেহে, মন্ত্রবলে প্রবেশ করলেন। তারপর যুবক হয়ে আবার জীবনের সুখ-আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন।
কিন্তু, বৃদ্ধ নারায়ণ নিজের বৃদ্ধের চেহারা ত্যাগ করার আগে একবার কাঁদলেন। আবার যুবকের দেহে প্রবেশ করে খুব হাসলেন।
বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল এবার প্রশ্ন করল—বলতো মহারাজ, নিজের দেহ ছাড়বার আগে বৃদ্ধ নারায়ন কাঁদলই কেন, আবার যুবকের দেহে প্রবেশ করে হাসলই বা কেন?
রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—বৃদ্ধ ভাবলেন, এই দেহ ছাড়ার সংগে সংগেই আমার ছেলে-মেয়ে, বৌ নাদি-নাতনি, সবার সংগে সম্পর্ক শেষ হোল। একথা ভেবেই, দুঃখে বৃদ্ধ কাঁদলেন। আর হাঁসলেন এইজন্য, আবার যুবক হয়ে খুশীমত চলাফেরা করে, জীবনকে উপভোগ করতে পারবেন বলে। সুখের এই কথা ভেবেই খুশীতে হেসে উঠলেন।
সঠিক উত্তর শুনে, বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে গিয়ে, শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছের ডাল থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধে ফেলে আগের মতই চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার ত্রয়োবিংশ গল্প……………

বেতালের ত্রয়োবিংশ গল্প

বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে ত্রয়োবিংশ গল্প............

ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণের ছিল দুই ছেলে, একজন ভোজনবিলাসী অন্যজন শয্যাবিলাসী। ভোজন-বিলাসী ছেলে, খাবারের মধ্যে সামান্যতম কোনও দোষ থাকলেও ধরে ফেলতে পারত। খাদ্যের এই দোষ অন্যেরা ধরতে না পারলেও ভোজনবিলাসী ঠিক ধরতে পারত। আর শয্যাবিলাসী ছেলে বিছানায় সামান্যতম ত্রুটি থাকলেও মুহূর্তে ত্রুটি বার করে ফেলত।

ক্রমে ভোজনবিলাসী আর শয্যাবিলাসী, এই দুই ছেলের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ঐ দেশের রাজার কানেও গেল। রাজা দুই ছেলেকে পরীক্ষা করার জন্য রাজধানীতে ডেকে আনলেন।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—তোমারা কে কোন বিষয়ে বিলাসী, ভাল

করে বুঝিয়ে বল। দুই ভাই নিজের নিজের ক্ষমতার কথা বলল।

রাজা তখন ভোজনবিলাসীকেই প্রথম পরীক্ষা করবেন ঠিক করলেন। রাজপাচককে ডেকে, ভোজনবিলাসীর জন্য নানান সুখাদ্য খাবার তৈরি করতে বললেন।

রাজার আদেশে রাজপাচক তার যত বিদ্যে জানা ছিল সবকিছু দিয়ে, নানান খাবার তৈরি করল। সেসব খাবারের যেমন গন্ধ, তেমনি স্বাদ। খাবার তৈরি হলে রাজার কাছে খবর গেল— খাবার তৈরি, ভোজনবিলাসী এবার খেতে আসতে পারেন।

ভোজনবিলাসী খাবার খেতে গেল। খাবার খেতে বসেই ভোজন-বিলাসী হঠাৎ খাবার ছেড়ে উঠে পড়ল। রাজার কাছে ফিরে গিয়ে বসতেই রাজা জিজ্ঞেস করলেন—কিহে ভোজনবিলাসী, খুব তৃপ্তি করে খেয়েছে তো ?

ভোজনবিলাসী বলল—না মহারাজ, খেতে আর পারলাম কৈ ?

—সে কি ! অবাক্ হয়ে গেলেন রাজা। বললেন, খেতে পারলে না কেন ?

—কি করে খাই মহারাজ ? ভাতে যে মড়ার গন্ধ। চাল বোধ হয় শ্মশানের ধারে-কাছের ক্ষেত থেকে আনা, তাই এই গন্ধ।

কথাটা শুনে রাজা ভাবলেন, ছেলেটার মাথা খারাপ আছে। তবুও ঠিক করলেন ব্যাপারটা যাচাই করা দরকার। তিনি কথাটা গোপন রেখে ভাণ্ডারীকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন—কোন চালে আজ রান্না হয়েছিল ?

ভাণ্ডারী উত্তর দিল—মহারাজ, শ্মশান ধারের ক্ষেতের সরু চাল দিয়ে আজকের রান্না হয়েছে।

ভাণ্ডারীর কথা শুনে রাজা চমকে উঠলেন। তিনি ভোজন-বিলাসীকে বললেন—না হে, সত্যিই তুমি ভোজনবিলাসী।

এবার রাজা শয্যাবিলাসীর পরীক্ষা নেবেন ঠিক করলেন।

শয্যাবিলাসীর জন্য এক সুন্দর শয়নঘরে, দুধসাদা পালকের মত নরম বিছানা পাতার আদেশ দিলেন। বিছানা পাতা হলে শয্যা-বিলাসী সেখানে শুতে গেল।

বিছানায় শুয়েই শয্যাবিলাসী লাফিয়ে, উঠল। রাজার কাছে এসে বলল—মহারাজ, এরকম বিছানায় শোওয়া অসম্ভব।

রাজা বললেন—সে কি! তোমাকে পালকের মত নরম বিছানা দেওয়া হয়েছে, তাতে শুতে কষ্ট হবে কেন?

শয্যাবিলাসী বলল—মহারাজ নরম বিছানা দিয়েছেন এটা ঠিক। সাতটা তুলতুলে নরম গদীও আছে, সেটাও ঠিক। কিন্তু মুশ্কিল হয়েছে সপ্তম গদীর নিচে, একটি ছোট চুল পড়ে আছে। আর সেইজন্যই পিঠে বড় লাগছে, শুতে পারছি না।

রাজা তক্ষুনি আদেশ দিলেন ব্যাপারটা পরখ করে দেখার জন্য। পরীক্ষা করে দেখা গেল সত্যিই, ওপর থেকে সবচেয়ে নিচে, সপ্তম গদীর তলায় একটি ছোট্ট চুল পড়ে আছে।

রাজা বললেন—না, তুমি দেখছি সত্যিকার শয্যাবিলাসী।

এই বলে রাজা দুই ভাইকেই পুরস্কার দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল এবার প্রশ্ন করল—বলতো মহারাজ, দু-জনের মধ্যে বেশি বিলাসী কে?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—আমার মতে শয্যাবিলাসী। শ্মশান

পাশের ক্ষেতের চালে কিছু গন্ধ আসা অসম্ভব নয়। যার অত্যধিক ঘ্রাণ শক্তি আছে, তিনি তা বুঝতেও পারেন। ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব কঠিন নয়। কিন্তু নরম সাতটা গদীর নিচে চুল থাকলে কষ্ট হওয়া, সে অসম্ভব ব্যাপার! তাই শয্যাবিলাসী সত্যিই বিলাসী।

সঠিক উত্তর শুনে, বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে গিয়ে, শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছের ডাল থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধে ফেলে, আগের মতই চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার চতুর্বিংশ গল্প.........................

বেতালের চতুর্বিংশ গল্প
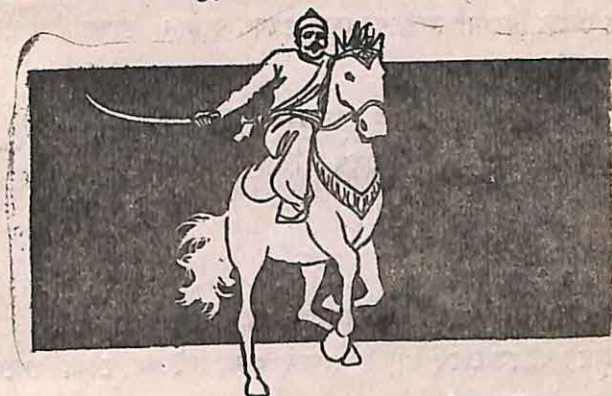
বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে চতুর্বিংশ গল্প—

কলিঙ্গদেশে, যজ্ঞবর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। বহুদিন ধরে দেবতার আরাধনা করে, দেবতার বরে, একটি ছেলে জন্মাল। যজ্ঞবর্মার ছেলে অল্পদিনেই সব শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠল। বিদ্বান, ধার্মিক, বিনয়ী বলে সুনাম অর্জন করল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র আঠারো বছর বয়সে ছেলেটি হঠাৎ মারা গেল। একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে শোকে ভেঙ্গে পড়লেন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। ছেলেকে সৎকার করার জন্য ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, গ্রামের শেষপ্রান্তে যে শ্মশান আছে, সেখানে নিয়ে এলেন।

ঐ শ্মশানে এক প্রাচীন তান্ত্রিক যোগী তপস্যা করতেন। ব্রাহ্মণ ছেলেটির অল্প বয়সের শব দেখে, সেই বৃদ্ধ যোগী ভাবলেন—আমি বুড়ো হয়েছি। বয়সের ভারে নড়াচড়া, কাজকর্ম কিছুই

করতে পারছি না। তাই আমার বৃদ্ধের দেহ ছেড়ে যদি ঐ কিশোরের দেহে প্রবেশ করতে পারি, তবে আরও বহুকাল যোগাভ্যাস করতে পারব। এইসব ভেবে, বৃদ্ধ যোগী নিজের দেহ ছেড়ে, কিশোর ব্রাহ্মণের দেহে প্রবেশ করল। ব্রাহ্মণ কিশোর বেঁচে উঠল।

ছেলেকে হঠাৎ বেঁচে উঠতে দেখে ব্রাহ্মণ আনন্দে হেসে উঠলেন। কিন্তু তারপরই কি ভেবে দুঃখে কাঁদতে লাগলেন।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল প্রশ্ন করল—বলতো মহারাজ, ছেলেকে বাঁচতে দেখে ব্রাহ্মণ প্রথমে হাসলেনই বা কেন, শেষে কাঁদলেনই বা কেন ?

রাজা বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন—ছেলেকে বেঁচে উঠতে দেখে, খুশী হয়েই হেসেছিলেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু পরের দেহে প্রবেশের মন্ত্র এই ব্রাহ্মণও জানতেন। তাই মুহূর্ত পরেই যখন বুঝতে পারলেন ব্রাহ্মণকুমারের দেহে, বৃদ্ধ যোগী প্রবেশ করেছেন, তখন বুঝলেন, তাঁর ছেলে সত্যি করে বাঁচেনি। তাই দুঃখে কাঁদলেন।

সঠিক উত্তর শুনে, বেতাল মুহূর্তে শ্মশানে গিয়ে, শিরীষ গাছের ডালে প্রলম্বিত হয়ে ঝুলতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্যও বেতালের পিছনে পিছনে ছুটে, শিরীষ গাছের ডাল থেকে বেতালকে নামিয়ে, কাঁধে ফেলে, আগের মতই চলতে লাগলেন।

বেতাল তখন শুরু করল তার শেষ পঞ্চবিংশ গল্প..............

বেতালের পঞ্চবিংশ গল্প

বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে শেষ পঞ্চবিংশ গল্প······

দাক্ষিণাত্যের ধর্মপুর নগরে এক রাজা ছিলেন, নাম মহাবল। সুখে শান্তিতেই রাজা মহাবল রাজত্ব করছিলেন।

কিন্তু একদিন, অন্যদেশের এক পরাক্রমশালী রাজা, বহু সৈন্য-সামন্ত, চতুরঙ্গিনী সেনা নিয়ে এসে রাজা মহাবলের রাজ্য আক্রমণ করলেন। দুই রাজায় ঘোরতর যুদ্ধ হোল। শেষে, রাজা মহাবল যুদ্ধ জয়ের আশা নেই দেখে, রাণী আর রাজকন্যাকে নিয়ে বনে পালিয়ে গেলেন।

রাজা বনের মধ্যে দিয়ে চলেছেন রাণী আর রাজকন্যাকে নিয়ে। চলেছেন তো চলেইছেন। যেতে যেতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনজনেই ক্লান্ত হয়ে গেলেন। রাণী আর রাজকন্যা বললেন—আমরা আর একপাও চলতে পারছি না।

রাজা তখন রাণী-রাজকন্যাকে বনের মধ্যে গাছের তলায় বসিয়ে, ফলমূল জল এসব জোগাড় করার জন্য, বনের মধ্যে চলে গেলেন। এদিকে রাজা গেছেন তো গেছেনই, আর ফেরেন না। ক্রমে সন্ধে হয়ে এল। বনের মধ্যে রাণী আর রাজকন্যা ভয়ে ভীত হয়ে বসে আছেন।

এদিকে, ঐদিনই কুন্ডিনের রাজা চন্দ্রসেন, জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে নিয়ে মৃগয়ায় বেরিয়েছিলেন। মৃগয়ার জন্য ঘুরতে ঘুরতে, বনের মধ্যে মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখে তাঁরা তো অবাক!

পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে, শেষে তাঁরা উপস্থিত হলেন রাণী আর রাজকন্যার সামনে। তাঁদের দেখে তো চন্দ্রসেনরা বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। অপরূপা সুন্দরী দুজনে, মলিন মুখে বসে আছে দেখে রাজা চন্দ্রসেন সব ঘটনা জানতে চাইলেন। রাণী সবকিছুই বললেন। তখন চন্দ্রসেন ও জ্যেষ্ঠ রাজকুমার পরামর্শ করে রাণী আর রাজকন্যাকে নিজ রাজ্যে নিয়ে এলেন।

কিছুদিন থাকার পর, যখন রাজা মহাবলের আর কোনও খবর পাওয়া গেল না তখন রাজা চন্দ্রসেন বিয়ে করলেন ধর্মপুত্রের সেই রাজকন্যাকে আর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বিয়ে করলেন ধর্মপুরের রাণীকে।

বেতালের গল্প শেষ হোল। বেতাল এবার প্রশ্ন করল—বলতো রাজা, চন্দ্রসেন রাজকন্যার ছেলে, আর রাজপুত্র রাণীর ছেলে

যদি হয়, তবে তাদের সম্পর্ক কি হবে? কে কাকে কি বলে ডাকবে?

রাজা বিক্রমাদিত্য হাসলেন। তারপর বললেন—উদ্ভট কথার কি উত্তর হয়? অসম্ভব কুশ্রী কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।

রাজার সুচিন্তিত উত্তর শুনে বেতাল এবার স্থির হয়ে রইল। শ্মশানে আর পালিয়ে গেল না। বরং বেতাল বলল—মহারাজ, শুনুন তবে এবার···

তাল বেতালের আবির্ভাব

বেতাল বলল—মহারাজ, তোমার সাহস, বুদ্ধি, ধৈর্য সবকিছু দেখে আমি খুশী হয়েছি। বুঝেছি তুমিই যোগ্যতম ব্যক্তি। তাই এখন কিছু উপদেশ দিচ্ছি, বুদ্ধি দিচ্ছি, মন দিয়ে শোন।

যে সন্ন্যাসী তোমাকে আমার এই সব আনতে পাঠিয়েছে, সেই সন্ন্যাসীর নাম শান্তশীল। আর এই যে আমার সব দেখছো, আমি ছিলাম রাজা চন্দ্রভানু। সন্ন্যাসী শান্তশীল যোগবলে আমাকে মেরে ফেলে। এখন তোমাকে, অর্থাৎ রাজা বিক্রমাদিত্যও যদি মারতে পারে, তবে সন্ন্যাসী শান্তশীলের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

এইজন্যই বলছি, আমাকে নিয়ে যখন সন্ন্যাসীর কাছে যাবে, তখন শান্তশীল তার যাগ-যজ্ঞ শেষ করে বলবে—মহারাজ, দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর।

সন্ন্যাসীর কথায় তুমি যদি সত্যিই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে যাও,

যদি হয় তবে —

তাহলে সেই মুহূর্তেই শান্তশীল খড়্গ নিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলবে।

তাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার বদলে একথাই বলবে—আমি রাজা; সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কাউকে করি নি। তাই জানি না, সাষ্টাঙ্গে কেমন করে প্রণাম করতে হবে। সন্ন্যাসী, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কি করে করতে হয় দেখিয়ে দাও, আমি তাহলে প্রণাম করব।

এরপর যোগী যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে, তুমি খড়্গ দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলবে। তারপর যোগীর শব আর আমার এই শব দুটো নিয়ে গিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণের কাছে উনানের ফুটন্ত তেলে ফেলে দেবে। তাহলে, সন্ন্যাসীর যোগসাধনার ফল, রাজা বিক্রমাদিত্য তুমিই ভোগ করবে।

এসব কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজা চন্দ্রভানুর শব নিয়ে যোগী শান্তশীলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হোল।

যোগী বলল—রাজা, আপনার কাজে আমি বড় খুশী হয়েছি।

তারপর যোগী শান্তশীল যোগবলে রাজা চন্দ্রভানুর শবকে বাঁচিয়ে তুলল। পুজাশেষে, চন্দ্রভানুকে দেবীর সামনে বলি দিল।

এবার যোগী শান্তশীল বলল—মহারাজ, আপনি এবার দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করুন।

রাজা বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন—আমি রাজা, প্রণাম গ্রহণই করি। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার নিয়ম তো জানি না। দেখিয়ে দিন, কি করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।

রাজার কথায় যোগী শান্তশীল যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে গেল, তক্ষুনি রাজা বিক্রমাদিত্য দেবীর সামনে রাখা খড়্গ দিয়ে যোগীর মাথা কেটে ফেলল।

দুষ্ট-যোগী শান্তশীলের এভাবে মৃত্যু হওয়ায় দেবতারা আনন্দিত হলেন। স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল রাজা বিক্রমাদিত্যের মাথায়। দেবলোক থেকে নেমে এলেন ইন্দ্র। বললেন—রাজা বিক্রমাদিত্য, তোমার সাহস বুদ্ধিতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। বল, কি বর চাও?

রাজা বিক্রমাদিত্য হাত জোড় করে বলেন—দেবাদিদেব, ইন্দ্র, আপানার করুণায় আমার কোন অভাব নেই। তবুও, যদি বর দিতেই চান, তবে এই বর দিন, বেতাল পঞ্চবিংশতির এই গল্প, যতদিন সূর্য-চন্দ্র-তারা থাকবে, ততদিন যেন মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে।

দেবরাজ ইন্দ্র বলেন—নির্লোভ রাজা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তথাস্তু। স্বর্গে ফিরে গেলেন দেবাদিদেব।

এরপর রাজা মন্ত্র পড়ে, ফুটন্ত তেলের মধ্যে রাজা চন্দ্রভানু আর যোগী শান্তশীলের শবদুটি ফেলে দিলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট কায় বিকট দুই দৈত্য ফুটন্ত তেলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে হাত জোড় করে বলল—মহারাজ। আমরা তাল-বেতাল। বলুন মহারাজ, কি আদেশ আপনার?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—'তাল-বেতাল' বলে যখনই ডাকব, তখনই তোমরা আসবে আমার কথামত কাজ করবে, এই রইল আদেশ। এখন যাও 'তাল-বেতাল'।

—যে আজ্ঞে মহারাজ। তাল-বেতাল অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্য ফিরে গেলেন রাজধানীতে। তারপর তাল-বেতালের সাহায্যে সমস্ত পৃথিবীর রাজা হয়ে উঠলেন।